আকাশ দস্যু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ENTERPRISE

ASB

দূরে এক টুকরো গাঢ় নীল রঙের মেঘ দেখে নী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, "ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো সত্যিকারের মেঘ। আমি কিন্তু আগে দেখেছি। ঐ মেঘটা আমার।"

রা বসে আছে ককপিটে। মেঘটা সেও দেখেছে। রা সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। গত চার-পাঁচ দিন কোনো মেঘের চিহ্নই দেখা যায়নি। এই নীল রঙের মেঘটা কোথা থেকে এল কে জানে।

নী জিজ্ঞেস করল, "রা-দি, আমি কি এই মেঘটায় স্নান করতে পারি? বড্ড ইচ্ছে করছে।"

রা বলল, "আচ্ছা করো। কিন্তু সেদিনকার মতন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পারবে না। আমরা পাঁচ পরা-মুহূর্তের বেশি খরচ করতে পারব না।"

রা রকেটের মুখ ঘোরাল।

রা-এর পুরো নাম রাত্তী। সবাই রা বলে ডাকে। যেমন নী-এর নাম নীলাঞ্জনা। তার কলেজের বন্ধুরা বলে নীলা, বাড়িতে ডাকনাম শুধু নী। নী-এর বয়েস চোদ্দ, এখন স্কুল শেষ হয়ে যায় দশ বছর বয়েসে, কলেজেও নী-র আর মাত্র এক বছর বাকি।

নী সাঁতারের পোশাক পরে তৈরি হয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল।

রা বলল, "দাঁড়াও, আগে ভাল করে দেখে নিই।"

রা রকেটটা নিয়ে মেঘটার চারপাশ একবার ঘুরে এল। সে দেখে নিতে চায়, এটা সত্যিই মেঘ না অভ্রলিকা। মহাশূন্যে দিনের পর দিন কোথাও এক ছিটে মেঘ দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের চোখ আকাশে মেঘ খোঁজে। তাই এক এক সময় চোখের ভুল হয়। ঠিক মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মতন আকাশেও নকল মেঘ দেখা যায়। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অভ্রলিকা।

রা দেখে নিশ্চিন্ত হল। গাঢ় নীল রঙের বেশ ঘন মেঘ। এই রকম মেঘে স্নান করায় খুব সুবিধে। রা-রও খুব স্নান করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু দু'জনের মধ্যে একজনকে থাকতেই হবে। নিয়ম হচ্ছে, যে আগে মেঘটা দেখবে, সেটা তার হবে। রা যদিও আগে দেখেছিল, কিন্তু সে- নিজের জন্য মেঘটা দাবি করলো না। নী-টা ছেলেমানুষ, ও-ই করুক।

নী বলল, "যদি ঝিলমদা জেগে থাকত, খুব হিংসে করত আমায়।"

রা বলল, "নে, বেশি দেরি করিস না কিন্তু। ট্যাবলেট খেয়েছিস তো?"

নী বলল, "হ্যাঁ।"

রা দরজা খুলে দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নী। দু'হাত ছড়িয়ে পাখির মতন উড়তে-উড়তে ঢুকে গেল মেঘের মধ্যে। তারপর তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

এই মেঘের মধ্যে স্নান ভারী মজার। হালকা তুলো-তুলো মেঘগুলো গায়ে লাগলেই জলকণা হয়ে যায়। সাঁতার কাটলে সুড়ঙ্গ হয়ে যায় মেঘের মধ্যে, একটু পরেই বুঁজে যায় আবার।

রকেটের তলার দিকে ঘরে ঘুমোচ্ছে রাত্রীর স্বামী ঝিলম। ওদের দুজনেরই বয়স তেইশ বছর। মাত্র সাতমাস আগে বিয়ে হয়েছে ওদের, অর্থাৎ পৃথিবীর হিসেবে সাত মাস। এখানকার হিসেবে অন্যরকম। বিয়ের পরই ওর এই রকেট নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে। অবশ্য শুধু বেড়ানো নয়, একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারলে বিরাট পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবী থেকে অনেকেই এখন মহাশূন্যে রকেট নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, সূর্য-মণ্ডলের বাইরে কোথাও ঠিক পৃথিবীর মতন একটা গ্রহ আছে নিশ্চয়ই। সেখানে মানুষ আছে, আর তারা পৃথিবীর মানুষের মতই হবহু। সেই গ্রহটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে প্রথম সেই গ্রহের সন্ধান পাবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাকে বিরাট পুরস্কার দেবে। এখন পরমাণু রকেট বেরিয়ে যাবার ফলে সূর্যমণ্ডলের বাইরে ঘোরাঘুরি জলভাতের মতন সহজ।

রাত্রীর স্বামী ঝিলমের পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ওদের এক বন্ধু ইউনুস। এই ইউনুস আগেও অনেক অভিযানে ঝিলমের সঙ্গে এসেছে। আর নীলাঞ্জনার এখন কলেজ ছুটি বলে ওকেও আনা হয়েছে সঙ্গে। ও খুব বেড়াতে ভালবাসে। নীলঞ্জনার আর একটা বড় পরিচয়, ও কবি।

মাঝখানে কবি খুব কমে গিয়েছিল। আজ থেকে সতেরো বছর আগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর আধুনিক শহর নাইরোবিতে বৈজ্ঞানিকরা এক সম্মেলনে বলেছিলেন, পৃথিবীতে যে হঠাৎ পাগলের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ এখন আর কেউ কবিতা লিখছে না। কোনো পত্রপত্রিকাতে আজকাল কবিতা ছাপা হয় না, দশ-বারো বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কোথাও একটাও কবিতার বই বেরোয়নি, এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এক্ষুনি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কবিতা লেখার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। কবিতা লিখতে-লিখতে অনেকে আধ-পাগল হয়ে থাকবে, পুরো পাগল হবে না, সে বরং ভাল।

এখন আবার দু'চারজন কবিতা লিখতে শুরু করেছে। নীলাঞ্জনার একটা কবিতা রা-র খুব ভাল লাগে। সেটা হচ্ছে এই ঃ

চাঁদের ও-পিঠে রাঙা-মাসিমার
মস্ত বাগান-বাড়ি,
লাল খরগোস ঘাস ভেবে খায়
মেসোমশাইয়ের দাড়ি!

কবিতাটি মনে পড়লেই হাসি পায় রা-র। নীলাঞ্জনার মাসি আর মেসো সত্যিই চাঁদে এই কিছুদিন আগে বেশ বড় বাগানওয়ালা একটা বাড়ি বানিয়েছেন। নীলাঞ্জনার মেসোমশাই নতুন-নতুন জন্তু-জানোয়ার বানান। আসার পথে রা দেখে এসেছে তাঁর বাগানে বেগুনি রঙের হরিণ, সবুজ ছাগল আর ঠিক বেড়ালের মতন ছোট-ছোট সাদা ধপধপে হাতি। সেগুলো সত্যিকারের জ্যান্ত।

আজ নীলাঞ্জনা মেঘে সাঁতার কাটতে গেছে। আজ নিশ্চয়ই ফিরে এসে মেঘ নিয়ে কোনো কবিতা লিখবে।

রকেটের ইঞ্জিনটা বন্ধ করে রা মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলল। গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল ছড়িয়ে পড়ল পিঠে। একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। কতদিন রা স্নান করেনি। নী যদি একটু রকেট চালানো জানত, তা হলে নী ফিরে এলে ওকে কন্ট্রোল রুমে বসিয়ে রা এর পর সাঁতার কেটে আসত। ঝিলম আর ইউনুস ঘুমোচ্ছে, ওদের জাগাবার কোনো উপায় নেই। আফ্রিকার সিয়েরা লিয়ন এখন মহাকাশচর্চার সবচেয়ে বড় জায়গা। সেখান থেকে রা রকেট-বিজ্ঞান শিখে এসেছে বলেই ওর হাতে রকেটের ভার দিয়ে ঝিলম আর ইউনুস নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে।

দূরের আকাশে একটা কালো বিন্দু দেখে রা সেইদিকে চোখ রাখল। কোনো উল্কা হলে একটু ভয়ের কথা আছে। এদিককার মহাকাশের যে মানচিত্র আছে তাতে কিছুদিন আগে দু-একটা ভুল ধরা পড়েছে। সন্ধান মিলেছে অনেকগুলো উল্কা আর ভাঙা তারকার। রা একটা জুম টেলিস্কোপ তুলে নিয়ে দেখল। না উল্কা নয়, আর-একটা রকেট। খুব সম্ভবত আমেরিকান রকেট। ওরা কি এই মেঘটাকে দেখতে পেয়েই আসছে? পরের মুহূর্তেই রা বুঝতে পারল, না, তা তো হতে পারে না। ওদের রকেটগুলো বড্ড পুরনো ধরনের, মহাশূন্যের মাঝখানে কোথাও স্থির হয়ে থেমে থাকার ক্ষমতা ওদের নেই।

রা মনে-মনে বলল, "আহা বেচারিরা!"

রা ইতিহাসে পড়েছে যে, অনেকদিন আগে আমেরিকান আর রাশিয়ানরা মহাকাশ-দৌড়ে খুব উন্নতি করেছিল। তারপর তাদের ছাড়িয়ে যায় চীন, তারপর ভারত। এখন তো আফ্রিকানদের জয়-জয়কার। ঐ কালো লোকদের যা বুদ্ধি, ওদের সঙ্গে কেউ পারে না। টাকাও ওদের বেশি। ঝিলমের গায়ের রং কুচকুচে কালো, ঠিক আফ্রিকানদের মতন, সেই জন্য পৃথিবীর কত মেয়ে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

আমেরিকান রকেটটা শাঁ করে উড়ে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঐ রকেটের লোকরা মেঘের-পাশে-থেমে-থাকা রা-এর রকেট দেখে খুব হিংসে করছে!

কিছুই করবার নেই বলে রা একটা বই খুলে বসল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে কোনো এক লেখকের লেখা একটা উপন্যাস। এই লেখকের নাম এখনকার কেউ জানে না, এ সব বইও আজকাল কেউ পড়তে চায় না। পাওয়াও যায় না এ-ধরনের বই। এখনকার লেখকদের বই পাওয়া যায় ছোট্ট-ছোট্ট ক্যাসেটে, পড়তেও হয় না। যখন ইচ্ছে রেকর্ডার চালিয়ে দিলেই শুনে নেওয়া যায়।

রা ইতিহাস পড়তে ভালবাসে বলেই এরকম দু-চারখানা বই যোগাড় করেছে এক পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে। বেশ মজা লাগে তার আগেকার যুগের এই সব গল্প পড়তে। মাত্র একশো বছর আগেকার কথা, তখন নাকি হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ইহুদি এই সব নানান ধর্ম আর জাত ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করত। এদেশে-ওদেশে যুদ্ধ লাগত। সত্যি, মজার ব্যাপার, না? এ যুগের অনেক ছেলেমেয়ে এসব শুনলে বিশ্বাসই করতে পারবে না।

এখন কারুর নামে কোনো পদবি নেই, তাই কোনো জাতও নেই। সবাই মানুষ, এই শুধু পরিচয়। স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের শিখতে হয় মাত্র দুটো ভাষা। নিজের মাতৃভাষা আর এসপারান্টো। পৃথিবীর যে-কোনো লোক অন্য দেশে গিয়ে এসপারান্টো ভাষায় কথা বলতে পারে, সবাই বুঝবে। এই ভাষা শেখাও খুব সহজ। অবশ্য এই ভাষায় ইংরেজি শব্দ একটু বেশি, কিন্তু পৃথিবীর সব ভাষার শব্দই এর মধ্যে আছে। যেমন, আমি কবিতা লিখি, এর এসপারান্টো হচ্ছে, জ্য রাইট কবিতা।

যে-বইটা রা পড়ছে, তাতে এক জায়গায় আছে যে, একটা গরিবের ছেলের ওপর এক জন বড়লোক খুব অত্যাচার করছে। পড়তে-পড়তে রা খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগল। কি অদ্ভুত ছিল আগের যুগের মানুষগুলো ! ওদের কি মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু ছিল না? শুধু ঝগড়া, মারামারি আর অত্যাচার আর দুঃখ। গরিব-বড়লোক আবার কী জিনিস? এখন তো ওসব কিছুই নেই। সব মানুষ সমান, যার যেমন গুণ, সে সেইরকম কাজ করে। কেউ বড় কেউ ছোট নয়।

ডান দিকে এক জায়গায় দুবার লাল আলো জ্বলে উঠতেই রা বইটা নামিয়ে একটা রিসিভার তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গলা ভেসে এল, "রকেট-সংখ্যা আলফা বিটা সাত দুই নয় শূন্য?"

রা বলল, "হ্যাঁ।"

ওদিক থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, "জীবন কি রকম?"

রা বলল, "চমৎকার!"

"স্পেস স্টেশন সাতাশ থেকে বলছি······ দশ নম্বর স্টেশন থেকে আপনাকে চাইছে·····ধরে থাকুন, লাইন জুড়ে দিচ্ছি।"

একটুক্ষণ ধরে থাকার পর আবার একজন জিজ্ঞেস করল, "আলফা বিটা সাত দুই নয় শূন্য?"

"হ্যাঁ, বলছি।"

"জীবন কী রকম?"

"অপূর্ব সুন্দর। এখন বলুন তো কী ব্যাপার?"

"পৃথিবী থেকে কেউ একজন কথা বলবে আপনার সঙ্গে। ধরে থাকুন সাবমেরিন স্টেশনের সঙ্গে লাইন জুড়ে দিচ্ছি। আপনার প্রত্যেকদিন আনন্দে কাটুক!"

"ধন্যবাদ। আপনারও প্রতিটি দিন আনন্দময় হোক।"

সাবমেরিন স্টেশন শুনেই রা বুঝতে পেরেছে কার টেলিফোন।

এই কিছুদিন হল তার মায়ের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। তাঁর একটু হাঁপানির অসুখ আছে বলে পৃথিবীর জল-হাওয়া সহ্য হয় না। অথচ অন্য কোনো গ্রহেও তিনি যাবেন না! সেই জন্য গত বছরে ভারত মহাসাগরে দু'মাইল জলের তলার কলোনিতে যে শস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছিল, সেখানে রা-র বাবা জমি কিনে একটা ছোট বাড়ি করেছেন।

রা অবশ্য বাড়িটা এখনো দেখেনি, তবে শুনেছে বেশ ভাল জায়গা। ওখানে মাছ খুবশস্তা।

"হ্যালো, হ্যালো, কে ঝিলম? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?"

"না, মা । আমি রা বলছি। হ্যাঁ, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা।!"

"ও, রা? বাপরে বাপ! আজকাল যা হয়েছে টেলিফোনের অবস্থা, কিছুতেই লাইন পাওয়া যায় না। সেই কখন থেকে তোকে ধরবার চেষ্টা করছি। শোন, তোকে একটা ভাল খবর দিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছিস?"

হ্যাঁ, মা খুব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। বলো—।"

"তবে কি আমারই কানের দোষ হল? তোর গলাটা যেন চিনতে পারছি না । শোন রা, আমাদের বাগানে যে কাঁচালঙ্কা-গাছ পুঁতেছিলুম, তাতে কাল ফুল ধরেছে, এবার লঙ্কা হবে। বুঝলি?"

"উঃ মা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না। এই তোমার ভাল খবর? এর জন্য টেলিফোন করলে? কত খরচ জানো?"

"ও-মা, ভাল খবর নয়? আমাদের এই অতল নগরী চারশো দুই-তে আর কারও বাড়িতে কাঁচালঙ্কা-গাছ আছে? এখানে লঙ্কাই পাওয়া যায় না। তুই তো জানিস, আমি একটু ঝাল ছাড়া একদম খেতে পারি না। এত ভাল-ভাল চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় এখানে, ইচ্ছে করে যে জিরে-পাঁচফোড়ন দিয়ে পাতলা ঝোল রাঁধব, কিন্তু তুই বল, কাঁচালঙ্কা ছাড়া জিরে-পাঁচফোড়নের ঝোল হয়?"

"বুঝেছি, বুঝেছি, খুব ভাল খবর। আমরা ফিরলে তোমার গাছের কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল রেঁধে খাইয়ো। তোমরা সব কেমন আছ?"

"ভাল আছি। তোরা ভাল আছিস তো? খুব বেশি দূরে যাসনি যেন। জামাই কোথায়? তাকে একটু দে না, কথা বলি।"

"সে তো ঘুমোচ্ছে। কথা বলার উপায় নেই তো।"

"ও, ঘুমোচ্ছে? বুঝেছি। তা কতদিন হল ঘুমোচ্ছে?"

"আটদিন।"

"আর কতদিন ঘুমোবে?"

"দাঁড়াও, হিসেব করে বলছি, হ্যাঁ আরও কুড়িদিন।"

"জাগলে আমায় একদিন টেলিফোন করতে বলিস। তোর বাবা হাঙর শিকার করতে গেছে। এখানে এসে খুব শিকারের শখ হয়েছে।"

"আচ্ছা মা, তোমরা সাবধানে থেকো, ভাল থেকো। এখন ছেড়ে দিই?"

"তোরা কবে আসবি?"

এ-কথার আর উত্তর দেওয়া হল না, লাইন কেটে গেল।

রিসিভারটা ঠিক জায়গায় রেখে ঘড়ি দেখল রা। এখনো নী ফিরল না কেন? এবার তো তার চলে আসা উচিত।

রা সামনে তাকিয়ে চমকে উঠে দেখল নীল মেঘটা চলতে শুরু করেছে। খুব জোরে, প্রায় রকেটের মতন গতিতে সেটা চলে যাচ্ছে দূরে।

।।২।। •

নী মনের সুখে সাঁতার কাটছিল মেঘের মধ্যে। একবার নামলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। নদী বা পুকুরে সাঁতার কাটার চেয়েও মেঘের মধ্যে সাঁতার অনেক আরামের, কারণ এতে হাত-পায়ের জোর খাটাতে হয় না। শুধু ভেসে গেলেই হয়।

মেঘের মধ্যে নিশ্বাস নেবারও কোনো অসুবিধে নেই। একটা ট্যাবলেট খেলে বুকের মধ্যে দু'ঘন্টার মতন অক্সিজেন জমা থাকে, সেই দু'ঘন্টা হাওয়াহীন জায়গাতে ভেসে বেড়ানো যায়। । নী হাতে একটা ঘড়ির মতন যন্ত্র পরে আছে, ঐ যন্ত্রটা তাকে রকেটটার সঙ্গে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রাখবে, দু'হাজার গজের বাইরে যেতে দেবে না। হঠাৎ কোনো দরকার হলে ঐ যন্ত্রটাতেই রা তাকে খবর পাঠাবে।

নীল মেঘের মধ্যে নী একটা জলপরীর মতন চিতসাঁতার দিয়ে ভাসতে লাগল। বিন্দু-বিন্দু জলকণায় শরীরটা যেন একেবারে জুড়িয়ে যায়। নী এর আগেও কয়েকবার পৃথিবীর বাইরে বেড়াতে এসেছে। চাঁদে তার রাঙামাসিমার বাড়ি, সেখানে এসেছে দুবার। আর একবার গরমের ছুটিতে বাবা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন বুধ-গ্রহে, তখন অবশ্য নী খুব ছোট, তবু তার একটু-একটু মনে আছে। বুধ-গ্রহটা খুব মজার, বিশেষ এক ধরনের জুতো পায়ে না-দিলে সেখানে হাঁটাই যায় না, যখন-তখন মাথাটা নিচে আর পা দুটো ওপরের দিকে উঠে যায়।

নী বাবার কাছে শুনেছে যে, আগে পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে বেড়াতে আসার অনেক ঝামেলা ছিল। জোব্বা-জাব্বা পরে, মুখে মুখোশ লাগিয়ে, পিঠে অম্লজানের কলসি নিয়ে ঘুরতে হত। নী দেখেছে তখনকার বি-গ্রহ যাত্রীদের ছবি। তারপর অম্লজান-বড়ি আবিষ্কার হবার পর সব কিছুই খুব সহজ হয়ে গেছে।

নী-র রাঙামাসিমা তো বলেছেন, কলেজের পড়া শেষ হলে তাকে চাঁদে এসে থাকতে। চাঁদে কাজ পাওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। আজকাল তো পৃথিবীতে মানুষ থাকতেই চায় না প্রায়। কলকাতা লণ্ডন নিউইয়র্ক এই সব আগেকার দিনের পুরনো

শহরগুলো খাঁ-খাঁ করছে। নী একবার বোম্বাই গিয়ে দেখেছিল, সেখানে হাজার-হাজার বাড়ি খালি পড়ে আছে, ঠিক যেন ভুতুড়ে শহর। ভারত সরকার এখন ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইনে ঐ বাড়িগুলো একই অবস্থায় রেখে দিতে চাইছেন। আসামের মত সুন্দর জায়গায় এখন তো মানুষ নেই বললেই চলে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সেখানকার টেলিফোন টেলিগ্রাফ পরমাণু-কেন্দ্র এসব চালাবারও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, যে-কোনো লোক এমনকি বিদেশীরাও যদি আসামে এসে থাকতে চায়, তা হলে তাদের আগামী পাঁচ বছর খাবার-দাবারের কোনো খরচ লাগবে না। তারা একটি করে বাড়িও পাবে বিনা পয়সায়।

নী অবশ্য সূর্যমণ্ডলের বাইরে আগে কখনো আসেনি। সূর্যের গ্রহগুলো তো সব জানা হয়ে গেছে, কোনোটাতেই মানুষের মত প্রাণী কিংবা অন্য কোনো জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সূর্যমণ্ডলের বাইরেই এখন বেশি মজা। এখনো কত রকম অজানা জিনিস যে দেখা যায়। এই যে মাঝে-মাঝে টুকরো-টুকরো জলভরা মেঘ, এর কথাই বা কে জানতো।

নী কতক্ষণ সাঁতার কেটেছে তার খেয়াল নেই। এক সময় সে টের পেল, সে শুধু একই জায়গায় থেমে আছে আর তার চারপাশ দিয়ে মেঘ উড়ে চলেছে। সে তখন দিক পাল্টাবার জন্য মাথা ফেরাল, কিন্তু সাঁতার কাটতে পারল না, তার হাত-পা চলছে না, মেঘই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এ কী ব্যাপার? অনেক চেষ্টা করল নী, তবু কিছুই হল না। ক্রমশই মেঘটার গতিবেগ বাড়ছে।

ভয় পেয়ে সে চিৎকার করে উঠল, "রা-দি, রা-দি।"

এখানে বাতাস নেই বলে গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পাবে না। চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। তার কব্জীতে বাঁধা ট্রান্সমিটারে কোনো শব্দ আসছে না। সে যে দূরে সরে যাচ্ছে তা কি রা-দি টের পায় নি? যন্ত্রটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল? ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল নী'র। কোনোক্রমে মাথা তুলে সে দেখল, বহু দূর থেকে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা এসে পড়েছে মেঘটার ওপর। সুতো দিয়ে যেমন ঘুড়ি টানে, সেই রকমভাবে কেউ যেন ঐ আলো দিয়ে মেঘটাকে টানছে। নী এইটুকু বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই ওটা কোনো চুম্বক আলো।

আর কিছু ভাবার সময় পেল না সে। মেঘের প্রচণ্ড গতিবেগ সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

এদিকে রা যখন দেখল, মেঘটা উড়ে চলে যাচ্ছে, তখনই সে রকেটটা আবার চালু করে দিয়েছে। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে। কিন্তু রা সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়। মহাকাশে অন্তত কয়েক কোটি মাইল রকেট চালিয়েছে সে এই বয়সেই, অনেক রকম বিপদের জন্য সে তৈরি থাকে।

ঝিলম আর ইউনুসকে ডাকবার কোনো উপায় নেই। ওরা বয়েস কমাবার ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে কিছুতেই ঘুম ভাঙবে না। সূর্যমণ্ডলের বাইরে

ঘুরতে গেলে পৃথিবীর হিসেবে বয়েস অনেক বেড়ে যায়। প্রথম-প্রথম যে-সব অভিযাত্রী এদিকে এসেছিল, তারা কেউ-কেউ ফিরেছে পঁচিশ কিংবা তিরিশ বছর পরে, ততদিনে তারা বুড়ো হয়ে গেছে। এখন সেই সমস্যা নেই, এখন এই ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে ঘুমোলে বয়েসটা থেমে থাকে, তারপর এক মাস, দু'মাস বা এক বছর বাদে ঘুম ভাঙলেও এই সময়টায় বয়স বাড়ে না। মহাকাশের সব অভিযাত্রীই পালা করে এই ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোয়।

রা তার রকেটের গতি বাড়িয়ে দিয়ে মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল। তারপর মেঘটার পাশাপাশি এসে রকেটের লেজের দিক থেকে অতিবেগুনি রশ্মি ছড়াতে লাগল মেঘটার ওপর। এমন সুন্দর মেঘটাকে নষ্ট করে দিতে হল তার, কিন্তু আর উপায় তো নেই। ঠিক যেমন দেশলাই-কাঠি জ্বললে তুলোর বাণ্ডিল পুড়ে যায়, সেই রকম অতিবেগুনি রশ্মিতে গলে গেল মেঘটা।

প্রায় চোখের পলকেই অদৃশ্য হয়ে গেল পুরো মেঘটা, শুধু দেখা গেল নী-কে। ঠিক যেন অগাধ সমুদ্রে ভাসছে ক্ষীরের পুতুল। নী-র হাত পা ছড়ানোর ভাব দেখেই ছ্যাঁত করে উঠল রা-র বুকের মধ্যে। নী এখনো বেঁচে আছে তো?

এর পর রা দেখল, মেঘটা গলে গেলেও নী-র শরীরটা থামছে না, সেটা তখনও ছুটে চলেছে সমান গতিতে। তার রকেটের পাশাপাশি চলেছে বলেই প্রথমটা সে বুঝতে পারেনি। ঠিক যেমন দুটো ট্রেন বা দুটো বিমান পাশাপাশি সমান গতিতে ছুটলে মনে হয়, দুটোই থেমে আছে। তখনই রা প্রথম লক্ষ করল, নী-কে টানছে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা। তার ভুরু কুঁচকে গেল। ওটা কিসের আলো?

বেশি চিন্তা করারও সময় নেই। রা আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লেসার বীম দিয়ে কেটে দিল আলোর রেখাটাকে। তারপর ঠিক সুতো-কাটা ঘুড়িরই মতন আস্তে-আস্তে দুলতে লাগল নী-র দেহ।

এর পরের কাজটাই শক্ত। রকেটটার গতি কমাতে-কমাতেই সেটা নী-কে ছাড়িয়ে চলে যাবে বহু দূরে। তারপর ফিরে এসে এই বিরাট মহাকাশের মধ্যে ঐটুকু একটা মানুষকে খুঁজে বার করাই দারুণ কঠিন। রা রকেটের মুখটা ঘুরিয়ে গোল করে ফিরে আসতে-আসতেই নী-কে ছাড়িয়ে সে চলে গেল বহু হাজার মাইল দূরে। তারপর রকেটের গতি একটু একটু কমিয়ে গোলটাকে ছোট করে আনতে লাগল। রকেট চালাতে-চালাতেই সে নানান রকম বোতাম টিপে অঙ্ক কষে যাচ্ছে।

এত রকম ব্যস্ততা ও উত্তেজনার মধ্যেও এই সময় রা-র হঠাৎ খুব একা লাগল। ইশ, এখন ঝিলম কিংবা ইউনুস যদি পাশে থাকত। তারপরেই সে চমকে উঠল। আরে! লেসার বীমের রেখাটা সে বন্ধ করতে ভুলে গেছে! সর্বনাশ। ওটা যদি নী'র গায়ে লাগত।

ঠিক হিসেব মতন ঘুরতে-ঘুরতে গোলটাকে ছোট করে এনে নী-কে দেখতে পেল রা। এখনো নী সেই রকম ভাবেই দুলছে। নী-র ছোট্ট সুন্দর শরীরটা যেন একটা

গোলাপ ফুলের পাপড়ি। আস্তে-আস্তে কাছে এসে একটা মস্ত বড় চায়ের ছাঁকনির মতন জিনিস বার করে সে লুফে নিল নী-কে। রকেটের ভিতরে এনেই নী-কে কোলে তুলে নিয়ে সে ছুটে গেল স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে। এটা রকেটের মধ্যে একটা ছোট ঘর, এখানে সব রকম রোগের চিকিৎসা করে কমপিউটার। রা-র আবার ডাক্তারি জ্ঞান একটুও নেই, এই ব্যাপারে ইউনুসের খুব অভিজ্ঞতা আছে।

স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে নী-কে খাটে শুইয়ে দেওয়ামাত্র চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। কমপিউটার থেকে দুটো হাত বেরিয়ে এসে ব্যবস্থা করতে লাগল সব কিছুর। হাত দুটো ইস্পাতের নয়, নরম রবারের, ঠিক মনে হয় কোনো মেয়ের হাত। রা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, দেওয়ালের একটা চৌকো জায়গায় নানান আলোতে নী-র হৃদ্‌স্পন্দন, নাড়ির গতি, রক্তের চাপ—এইসবের হিসেব ফুটে উঠছে। উইনুস থাকলে এই সব দেখলেই বলতে পারত, এর থেকে কোনো বিপদের ভয় আছে কি না।

তারপরই রা-র মনে পড়ল, ও হরি, ইউনুস থাকলেও তো কোনো লাভ ছিল না। ইউনুস তো এক বছরের জন্য নিঃশব্দ বড়ি খেয়ে নিয়েছে। এই এক বছর ইউনুসের কথা বলার ক্ষমতা থাকবে না। এরা প্রায়ই এক বছর দু'বছরের জন্য কথা বলা কিংবা কানে শোনা এমন কি চোখে দেখা বন্ধ করে আয়ু বাড়িয়ে নেয়। শরীরের এক-একটা অঙ্গকে মাঝে-মাঝে এরকম বিশ্রাম দিলে তারা আরও জোরালো হয়।

রা-র বুকের ভিতর টিপ-টিপ করছে। নী-র যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে ওর বাবা-মকে সে কী বলে সান্ত্বনা দেবে! কেন সে মেয়েটাকে মেঘে সাঁতার কাটার জন্য নামতে দিল। অথচ, আগেও তো সে এরকম তিন-চারবার মেঘে সাঁতার কেটেছে, কখনো তো কোনো বিপদ হয়নি? ওই আলোর রেখাটা কোথা থেকে এল? ঝিলম জেগে থাকলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত, ওটা কী। আবার খুব একা লাগল রা-র।

এই সময় খুব শান্ত মিষ্টি গলায় একজন বলল, 'বেশি ভাবনা করো না রা, মেয়েটি ভাল হয়ে যাবে।"

রা মুখ তুলে বলল, "সত্যি, জিউস? ওঃ তোমায় কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!"

"ওরকম মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে না থেকে আমায় জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে।"

"আমি ভাবলাম, তুমি ব্যস্ত । তাই তোমায় বিরক্ত করিনি।"

"তোমার যখন একা-একা লাগে, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?"

"ঠিক বলেছ, জিউস? এবার থেকে মাঝে-মাঝে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব। তোমার কাজের অসুবিধে হবে না তো?"

"যতই কাজ থাকুক, আমারও তো মাঝে-মাঝে একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়। জীবন কী-রকম, রা?"

"অপূর্ব সুন্দর।"

"তোমার জীবন আরও মধুময় হোক রা!"

কমপিউটারটির থেকে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এল, পুরুষের মতন হাত। রা সেই হাত দুটি চেপে ধরে বলল, "তুমি খুব ভাল জিউস, তোমার মতন আর দুটি দেখিনি কোথাও! আচ্ছা, জিউস, তুমি বলতে পারো, ঐ যে আলোর রেখাটা মেঘটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ওটা কী?"

"ও-রকম আগে কখনো দেখিনি।"

"ওটা কি প্রাকৃতিক? না কেউ ইচ্ছে করে অমনি ভাবে টানছিল?"

"সেটাও বুঝতে পারলুম না!"

"সে কী, তুমি এত জ্ঞানী, তুমিও জানো না?"

"হা-হা-হা-হা। তুমি এত মজার কথা বলো রা! জীবনে এখনো কত কিছু অজানা রয়ে গেছে, কত রহস্যের মীমাংসা হয়নি, দিন-দিন রহস্য বেড়েছে বলে তো জীবনটা এত মজার। সব-কিছু জানা হয়ে গেলে তোমাদের কি আর বাঁচতে ভাল লাগবে?"

"তা ঠিক বলেছ। তবু আমার মনটা খুঁত খুঁত করছে। নী-কে আর-একটু হলেই হারাতাম। লেসার বীমে এ আলোর রেখাটা খুব সহজেই কেটে গেল অবশ্য—"

"তুমি জুপিটারকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি একটু পরে জুপিটারের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করে দেবার চেষ্টা করব। জুপিটার সব সময় এত ব্যস্ত থাকে যে, বেচারির নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই।"

জুপিটার আর-একটা অতিকায় কমপিউটার, সেটি বসানো আছে মহাশূন্যে স্টেশন নং একুশে। এর চেয়ে বড় কমপিউটার মানুষ এখনো তৈরি করতে পারেনি। এটার খরচ দিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, তাই পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষ যে-কোনো সমস্যা নিয়ে জুপিটারকে প্রশ্ন করতে পারে।

"শোন, রা, ঝিলমকে বলো, আলোর চুম্বকশক্তি নিয়ে তোমাদের আরও গবেষণা করা দরকার। এই ব্যাপারে আফ্রিকানরা তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে।"

"ঠিক বলেছ, জিউস!"

"ঐ দ্যাখো, মেয়েটি চোখ মেলেছে!"

রা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল নী-র দিকে। নী তার টলটলে চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। রা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, নী, এখন কেমন লাগছে? ওঃ যা চিন্তায় ফেলেছিলি!"

নী কোনো উত্তর দিল না।

রা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এই নী, নী আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না? এই দ্যাখ, আমি রা-দি, তোর কোনো ভয় নেই—"

নী যে সত্যিকারের কবি তার প্রমাণ পাওয়া গেল এবার। জ্ঞান ফেরার পর সে প্রথম কথা বলল কবিতায়। সে বলল ঃ

"কালো মেঘ পাহাড়ের
বুকে গিয়ে কাঁদে,
লাল মেঘ ঝড় তোলে
মঙ্গলে চাঁদে,
নীল মেঘ ঘুম দেয়,
আলো দিয়ে বাঁধে,
সাদা মেঘ, সাদা মেঘ,
সাদা মেঘ, এসো।.......

।।৩।।

গোলাপি-রঙা রোদের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে রকেটটা।

এদিকে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, যার আলোর রঙই গোলাপি। কিন্তু এমন সুন্দর রঙ হলেও এই আলো খুব গরম। একবার ঝিলম এই গোলাপি রোদের মধ্যে রকেটের বাইরে বেরিয়েছিল, তাতে তার পিঠ এমন ঝলসে গেছে যে, গোলাপি-গোলাপি ছাপ পড়ে গেছে। এই আলোর এলাকা থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চায় রা।

নী খাবার তৈরি করে এনেছে, ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। খাওয়া মানে একটা করে স্যাণ্ডউইচ আর এক কাপ সুপ। দীর্ঘ যাত্রার সময় একসঙ্গে বেশি খাবার খাওয়া যায় না, খেলেই গা গুলোয়।

রা বলল, "নী, এবার তোকে রকেট চালানো শিখিয়ে দেব। তুই অ্যাসট্রো-ফিজিক্স পরীক্ষায় কী-রকম নম্বর পেয়েছিলি রে?"

নী লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল, "বলব না!"

"ওমা, বলবি না কেন?"

"না, আমার ওসব কথা বলতে ভাল লাগে না!"

রা 'ওঃ হো-হো' বলে হেসে উঠল। তার মনে পড়ে গেছে। হাসতে-হাসতেই সে বলল "ও, তুই তো সব পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হোস, সেইজন্য বলতে লজ্জা পাচ্ছিস! তুই কী করে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হোস রে? বেশি পড়াশুনো করতে দেখি না তোকে?"

নী বলল, "আমি কী করব, আমি একবার যা চোখে দেখি, তা সব আমার মনে থেকে যায়।"

"তোদেরর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়নি মহাকাশে?"

"সে তো পৃথিবী থেকে মাত্র পাঁচ হাজারর মাইল ওপরে। সে আর এমন কী।"

"ঠিক আছে, আজ থেকে তোর রকেট চালানোর হাতে খড়ি হবে। তুই আমার পাশে বসে আসন-বন্ধনীটা কোমরে বেঁধে ফ্যাল্!"

ঠিক এই সময় একটা লাল আলো জ্বলে উঠল এবং হিস্ হিস্ শব্দ হতে লাগল মাথার ওপরে। রা একটা রিসিভার তুলে নিতেই শোনা গেল, "এস ও এস, এস ও এস, সবাইকে ডাকছি, প্রক্সিমিটি লাল গোলাপ, কেউ কি শুনতে পাচ্ছ...........।"

কিছুক্ষণ শোনার পর রা রিসিভারটা আবার রেখে দিল।

নী জিজ্ঞেস করল, কী হল? কে কথা বলল?"

রা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, "লাল গোলাপ নামে এদিকে একটা উপগ্রহ আছে, সেখানে একটা রাশিয়ান রকেট ক্রাশল্যাণ্ড করেছে। তাই সাহায্য চাইছে।"

"আমরা সেদিকে যাব না?"

"আমাদের তো কোন দরকার নেই যাবার। ওরা চতুর্দিকে খবর পাঠাচ্ছে। এদিকে কাছেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটা স্পেস-স্টেশন আছে, সেখান থেকে দমকল যাবে----"

"রা-দি, যদি কোনো কারণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্পেস স্টেশন ওদের খবর শুনতে না পায়? ওরা বিপদে পড়েছে, আমাদের যাওয়া উচিত না?"

আমরা শুধু-শুধু সময় নষ্ট করব কেন? এমনিতেই কতটা সময় খরচ হয়ে গেল! এই রাশিয়ান আর আমেরিকানদের ওপর আমার বড্ড রাগ হয়। ওদের দেশের অনেক লোক এখন খেতে পায় না, ওদের আবার রকেট ভাসাবার বিলাসিতা করবার কী দরকার? গত বছরের হিসেবে দেখেছি ঐ দুটো দেশের একুশ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে! আফ্রিকা আর আমাদের দেশের সাহায্য না পেলে তো ওরা চালাতেই পারে না, তবু মহাকাশ গবেষণায় এত টাকা নষ্ট করা চাই! এই দ্যাখ না, এতটুকু দেশ বাংলাদেশ, কিন্তু কি দারুণ উন্নতি করেছে, সেই তুলনায় ঐ বড় বড় দেশগুলো--"

রা-দি, তুমি যাই বলো, মানুষ বিপদে পড়লে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।"

"তুই যে একেবারে দয়ার অবতার হলি! দাঁড়া, আগে দেখি রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস স্টেশন খবরটা পেয়েছে কি না।"

রা অনেকগুলি বোতাম টিপে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্টেশনকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। আপন মনে সে বিড়বিড় করে বলল, "কোনো কারণে সারকিট জ্যাম হয়ে গেছে। ওরা বোধহয় কিছু শুনতে পায়নি।"

"রা-দি, তা হলে?"

"যেতেই হয় দেখছি। আবার অনেকখানি সময় খরচ! তুই পাঁচ নম্বর মানচিত্রটা বার করে এনে আমার সামনের এই ফ্রেমটাতে বসিয়ে দে।"

ককপিটের পাশেই মানচিত্র-লাইব্রেরি। নী চট করে সেখান থেকে পাঁচ নম্বর মানচিত্রটা খুঁজে এনে ফ্রেমে লাগিয়ে দিল। মানচিত্রটি ত্রিস্তর! ফ্রেমে বসাতেই যেন মহাকাশের একটা অংশ ওদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। খালি চোখে তাকালে এই মহাকাশকে শুধু মহাশূন্য বলে বোধ হয়, কিন্তু এই ম্যাপে কতরকম ফুটকি রয়েছে। আবার কিছু অদ্ভুত চেহারার, ঠিক খেলনার মতন, ছবি।

একটা ফুটকির দিকে আঙুল দেখিয়ে রা বলল, "এটা হল লালগোলাপ, একটা ছোট উপগ্রহ, বেশ দূরে আছে। খুব লাল রঙের পাতল-পাতলা মেঘ এই উপগ্রহটা ঘিরে আছে, সেই জন্য দূর থেকে এটাকে লাল গোলাপের মতন দেখায়।'

অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট গতি-পথ বার করে রা রকেটের মুখ ঘোরাল সেই দিকে। তারপর সে চেষ্টা করল বেতার-টেলিফোনে লালগোলাপের বিপন্ন রকেটটির সঙ্গে যোগাযোগ করবার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাদের আর ধরা গেল না। রা বেশ অবাক হল। সে নী-কে বলল, "তুই ধরেছিস যখন, যেতেই হবে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের রকেটে আর একজনের বেশি লোককে জায়গা দেওয়া যাবে না। ওদের রকেটটা যদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর তিন-চারজন মানুষ থাকে, তা হলে কী করব?"

নী বলল, "আমরা ওদের চিকিৎসা কিংবা খাবার দিয়ে সাহায্য করতে পারি অন্তত।"

"তুই কখনো ধ্যান-ট্যাবলেট খেয়েছিস, নী?"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ, রা-দি, আমার এখনো পনের বছর বয়েস হয়নি। তার আগে ঐ ট্যাবলেট খাওয়া নিষেধ না?"

"মুশকিল হচ্ছে, আমি রকেট চালাচ্ছি তো, এখন আমার পক্ষে ঐ ট্যাবলেট খাওয়া ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ ঘোর থাকে। তোর চোদ্দ বছর তো হয়ে গেছে, এখন খেলে দোষ নেই। তোর সাহায্য আমার দরকার এখন।"

হাতব্যাগ থেকে দুটি ট্যাবলেট বার করে নী-কে দিয়ে রা বলল, "এই দুটো তোর জিভের তলায় রেখে দে। তারপর চোখ বুঁজে শুধু লালগোলাপ গ্রহটার কথা চিন্তা কর! অন্য কোনো চিন্তা যেন মনে না আসে।"

নী ট্যাবলেট দুটো মুখে দিয়ে চোখ বুঁজে বসল। রা হাতঘড়িটা দেখে আবার মন দিল রকেট চালনায়।

ঠিক দশ মিনিট বাদে নী চেঁচিয়ে বলল, "দেখতে পাচ্ছি, রা-দি, দেখতে পাচ্ছি, অপূর্ব সুন্দর!"

রা বলল, চোখ খুলিস না চ্যাঁচাসনি! আস্তে-আস্তে বল, আরো ভাল করে দ্যাখ।"

"ঠিক ফুলের পাপড়ির মতন লাল-লাল মেঘ, সত্যি লালগোলাপের মতনই দেখতে গ্রহটাকে--"

"গ্রহ নয়, উপগ্রহ। যাই হোক মেঘের ভেতর দিয়ে দ্যাখবার চেষ্টা কর। ওখানে ছোট-ছোট পাহাড় আছে।"

"দেখতে পাচ্ছি একটা পাহাড়। তার মাথার দিকে চাঁদের মতন কী যেন জ্বলছে।"

"চাঁদ নয়, ওটাই ওর গ্রহ। পাহাড়ের নিচের দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ, ঐ যে একটা রকেট, কাত হয়ে পড়ে আছে, খুব জোর আঘাত লেগেছে মনে হচ্ছে।"

"কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না?"

"তাও দেখা যাচ্ছে, একজন শুয়ে আছে মাটিতে, আর দু'জন বসে আছে পাশে।"

"সবাই পুরুষ, না মেয়ে আছে?"

"তা বোঝা যাচ্ছে না। সবার মাথায় স্পেস হেলমেট।"

"লালগোলাপে এমনিতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বোধহয় ওদের অম্লজান-বড়ি ফুরিয়ে গেছে।"

"রা-দি, ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় না? এত কাছে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন ডাকলেই শুনতে পাবে।"

"না, কথা বলা যায় না মা। তুই কাছে ভাবছিস, আসলে ওরা সাতচল্লিশ হাজার কিলোমিটার দূরে। এবার চোখ খোল, আর কষ্ট করার দরকার নেই।"

নী চোখ খোলার পরও মুখখানা হাসি-হাসি করে রইল। আপন মনে বলল, "আমি এখনো লালগোলাপ-উপগ্রহটা দেখতে পাচ্ছি······ মেঘগুলো দুলছে--"

রা বলল, "এই তো তোদের নিয়ে মুশকিল। এইজন্যই অল্পবয়সীদের ধ্যান-বড়ি খাওয়াতে নিষেধ করে। ঘোর কাটতে চায় না। দাঁড়া আমি ব্যবস্থা করছি।"

রা একটা বোতাম টিপে দিতেই ডান পাশের দেয়ালের খানিকটা অংশ সরে গেল, সেখানে দেখা গেল একটা চৌকো সাদা পর্দা। আর একটা বোতাম টিপতেই সেই পর্দার ওপর শুরু হয়ে গেল সিনেমা। বৃহস্পতিগ্রহের লছমি পাহাড়ের চূড়ায় চারটি ছেলে-মেয়ের অভিযান। ফিল্মটা কুড়ি-পঁচিশ বছরের পুরনো, কিন্তু গানগুলো এত ভাল যে, এখনো ভাল লাগে। দু'খানা গান গেয়েছে হংকংয়ের একটা ডলফিন। এই ডলফিনটা এসপারান্টো ভাষায় দারুণ গান গায়। নীর মেসোমশাই ওঁদের চাঁদের বাড়িতে একটা কোকিলকে চমৎকার পল্লীগীতি গাইতে শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটা গান সকলের খুব ভাল লাগে সেই গানটা হল "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।" এই পল্লীগীতিটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে আগেকার দিনের একজন সাধু।

সিনেমা দেখতে-দেখতে এই দুটি মেয়ে মহাশূন্য দিয়ে উড়ে চলল অন্য একটা বিপদে-পড়া রকেটের মানুষদের উদ্ধার করতে।

সিনেমাটা শেষ হবার আগেই হঠাৎ রা এক সময় সুইচ বন্ধ করে দিয়ে বলল, "নী, শিগগির বাইরে দ্যাখ, একরম দৃশ্য সহজে দেখতে পাবি না!"

নী সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী দেখব? কই কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো?"

"ভাল করে তাকিয়ে থাক্।"

ধোঁয়ার মতন কী যেন ভাসছে। আকাশে এত ধোঁয়া এল কী করে?"

"আমি একটু বাঁ পাশে সরে যাচ্ছি , তখন ভাল করে দেখতে পাবি।"

সেই ধোঁয়া থেকে রকেটটা খানিকটা বাঁ পাশে সরে যেতেই নী চমকে উঠল, মনে হল, একটা প্রকাণ্ড বিড়াল যেন আকাশ জুড়ে হুমড়ি খেয়ে আছে, সারা শরীরটা টান-টান, পেছনের পা দুটো গুটিয়ে আছে শরীরের সঙ্গে, তার লেজটা শরীরের চেয়েও বড়। বেড়ালের মতন দেখতে বটে, কিন্তু সেটা যে কত হাজার কিলোমিটার লম্বা তার ঠিক নেই।

"ওটা কী, রা-দি?"

"কী বল্ তো। আন্দাজ কর।"

"এ রকম জিনিস কখনো দেখিনি।"

"ওটা একটা ধূমকেতু। তুই আগে ধূমকেতু দেখিসনি কখনো?"

"ছবিতে দেখেছি। কিন্তু ধূমকেতু যে এমন হয় জানতাম না তো?"

"আমাদের যাওয়া-আসার পথে তো অনেক ধূমকেতু পড়ে। কিন্তু এটার বিশেষত্ব হচ্ছে, এটা দেখতে ঠিক একটা জীবন্ত প্রাণীর মতন। এটাকে আমি আগে একবার মাত্র দেখেছি।"

"মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা বেড়াল লাফ দিয়েছে। আচ্ছা রা-দি, ঐ ধূমকেতুটার মধ্যে ঢোকা যায় না?"

বেড়ালের পেটে ঢুকে যাবি, তারপর যদি আর বেরুতে না পারিস? তা ছাড়া আমরা একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি, এখন খেলা করবার সময় নয়।"

ধূমকেতুটার অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল নী। ওদের রকেট সেটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল।

খানিক বাদেই দেখা গেল লালগোলাপ-উপগ্রহটিকে।

সেটির কাছাকাছি আসতেই নী উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল "ঠিক একরকম! ধ্যান-বড়ি খেয়ে ঠিক এইরকম দেখেছিলাম।"

রা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নানারকম বোতাম টেপায়। পাতলা-পাতলা লাল রঙের মেঘ উড়ছে উপগ্রহটিকে ঘিরে। রা দুটি চশমা বার করে একটা পরে নিল নিজে, আর-একটা এগিয়ে দিল নীর দিকে। এই চশমা না পরলে লালগোলাপ-উপগ্রহে নেমে কিছুই চোখে দেখা যায় না। নানা রকম ট্যাবলেট বার করে রা নিজেও খেয়ে নিল, নী-কেও খাওয়াল। রকেটটা এক্ষুণি মাটি ছোঁবে।

শেষ ঝাঁকুনিটা সহ্য করার জন্য দু'জনেই আসন-বন্ধনী কোমরে বেঁধে, মাথার নিচে হাত রেখে চোখ বুঁজে রইল। রা গুনতে লাগল, এক দুই তিন চার। ঠিক দশ গোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি লাগল বেশ জোরে।

রা চোখ খুলে বলল, " এসে গেছি!"

রকেট থেকে নামবার আগে রা একবার দেখে এল ঝাঁকুনির জন্য ঝিলম আর ইউনুসের কোনো অসুবিধে হয়েছে কিনা। কিছুই হয়নি, দুটি কাচের বাক্সের মধ্যে ওরা দু'জনে অঘোরে ঘুমোচ্ছে! দেখলে মনে হয় যেন দুটি পুতুল।

বাক্স দুটির ভেতর লাগানো আছে দুটি ঘড়ি। সময় হয়ে গেলেই খুব জোরে বেল বাজিয়ে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। ঘড়ি দেখে রা বুঝল, ওদের ঘুম ভাঙতে আর খুব বেশি দেরি নেই।

সিঁড়ি আগেই নেমে গেছে, এবার দরজা খুলে ওরা নেমে এল নীচে। দু'জনেই ওভারকোট গায়ে দিয় নেমেছে। লালগোলাপ উপগ্রহটিকে ওপর থেকে যত সুন্দর দেখায় আসলে জায়গাটা অবশ্য তেমন সুন্দর নয়। মাটির রঙ বারুদ রঙের, এবড়ো-খেবড়ো, কোনোরকম প্রাণীর চিহ্ন নেই এখানে। লাল রঙের মেঘগুলোতে অম্লজান নেই বলে কখনো বৃষ্টি হয় না, শুধু শোভা হয়েই ভেসে বেড়ায়।

রা বলল, "সাবধানে হাঁটবি, ঠিক ভাবে পা ফেলে ফেলে, একটু তাড়াহুড়ো করলেই হোঁচট খেয়ে পড়বি।"

নী বলল, "রা-দি, ঐ যে ধূমকেতুটা দেখলাম, ঐটা নিয়ে একটা কবিতা আমার মাথায় এসেছে।"

"পরে শুনব, এখন কবিতা শোনার মেজাজ নেই। ভাঙা রকেটটা দেখতে পাচ্ছিস?"

"কই, না তো।"

"চশমাটা ঠিক করে পরিসনি নিশ্চয়ই। দু'হাত চেপে ঠিক করে বসিয়ে নে।

অন্য একটা রকেট একটা টিলার পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। রা সেটার কাছে এসে ভুরু কুঁচকে তাকাল। রকেটটার রঙ কালো, গায়ে কোনো দেশের চিহ্ন আঁকা নেই, গড়নটাও অচেনা ধরনের। দরজাটা খোলা। কিন্তু সিঁড়ি নেই।

টিলার গায়ের সঙ্গে রকেটটা লেগে আছে বলে রা সেই টিলার ওপরে খানিকটা উঠে গিয়ে বলল, "তুই নিচে থাক, নী, আমি ভেতরটা দেখে আসছি।

রা ভেতরের দরজার গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভেতরে কেউ আছে?"

কোনো উত্তর এল না।

দু'তিনবার ডেকেও কোনো সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। রা ওভারকোটের পকেট থেকে একটা পেন্সিলটর্চ বার করল, সেটাতে অসম্ভব জোর আলো হয়। সেই আলোতে রা রকেটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখল। ভেতরে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। শুধু তাই নয়, রকেটটা দেখে রা-র মনে হল, এটা অনেকদিন চালু নেই, যন্ত্রপাতি অধিকাংশই অকেজো। খবর পাঠাবার যন্ত্রটি রা বেশ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেখল। যন্ত্রটা একেবারেই খারাপ, এই যন্ত্র দিয়ে খবর পাঠাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

রা নিচে নেমে এসে বলল, "আশ্চর্য।"

নী মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন দেখছিল, মাথা তুলে বলল, "রা-দি, এখানে মনে হচ্ছে রক্তের দাগ।"

রা দেখল বারুদ-রঙা মাটির ওপরে খানিকটা কালো-কালো ছোপ। রক্ত হলেও হতে পারে। সে বলল, "ওটা যদি রক্তের দাগ হয়ও, তা হলেও বেশ পুরনো, দু'এক দিনের নয়। কিন্তু এই রকেটের লোকজন গেল কোথায়? খবরই বা কে পাঠাল?"

"ভেতরে কেউ নেই?"

"না।"

"বোধ হয় আমাদের দেরি দেখে তারা অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।"

"না, আমরা ভুল জায়গায় এসেছি। অন্য কোনো রকেটের যাত্রীরা আমাদের সাহায্য চেয়েছে। এটা এখানে পড়ে আছে অনেক আগে থেকেই।"

"তা হলে? আমরা কি পায়ে হেঁটে খুঁজব, না আবার আমাদের রকেটে চেপে-"

নী-র কথা শেষ হল না। টিলার অন্য পাশ দিয়ে একসঙ্গে সমান তালে পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে এল পাঁচজন মানুষ। তারা প্রত্যেকেই স্পেস-হেলমেট পরে আছে বলে তাদের মুখ দেখা যায় না ভাল করে। একজনের হাতে ঝোলানো একটা চকচকে ইস্পাত-রঙের বাক্স।

ওদের পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে নী বলল, "রা-দি, ঐ লোকগুলোকে আমার মোটেই ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওরা আসবার আগেই চলো আমরা রকেটে উঠে পালিয়ে যাই।"

রা বলল, "ছেলেমানুষি করিস না, চুপ করে দাঁড়া।"

লোকগুলি এসে ওদের চার পাশ ঘিরে দাঁড়াল।

॥ ৪ ॥

রা কোনো কথা বলল না।

অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বলতে হয়, জীবন কী রকম, অথবা আপনার জীবন সুন্দর হোক, এই ধরনের কিছু। ছেলেরা আর মেয়েরা থাকলে প্রথমে ছেলেরাই বলে, সেটাই ভদ্রতা।

এরা সেরকম কিছুই বলল না। চৌকো বাক্সওয়ালা লোকটি একটু কাছে এগিয়ে এসে রা-র মুখের দিকে তাকিয়ে এসপারান্টো ভাষায় বলল, "বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, আপনারা আমাদের বন্দী? আপনারা দু'জনেই চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলুন।"

রা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কে?"

লোকটি বলল, "প্রশ্ন করলেই উত্তর পাবার অধিকার সবার থাকে না। বিশেষত বন্দীদের থাকে না।"

লোকটার গলার আওয়াজ খুব কর্কশ। কিংবা ইচ্ছে করেই ওদের ভয় দেখাবার জন্যই বোধহয় হেঁড়ে গলায় কথা বলছে।

এবার রা কোটের পকেট থেকে ডান হাতটা বার করল। সেই হাতে খুব ছোট্ট একটা রিভলবার। সেটা দিয়ে লোকগুলোকে গুলি করবার কিংবা ভয় দেখাবার কোনো চেষ্টাই করল না। সামনের মাটিতে একখণ্ড পাথরের দিকে টিপার টিপল। কোনো শব্দ

হল না, কিন্তু দেখা গেল কোনো অদৃশ্য শক্তিতে সেটা মুড়মুড় করে ভেঙে যেতে যেতে একেবারে ধুলোর মতন গুঁড়িয়ে গেল।

রা মুখ খুলে বলল, "এই পিস্তলটা দিয়ে ইচ্ছে করলে মানুষ কিংবা তার চেয়েও বড় কোনো প্রাণীর দেহ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।"

চৌকো বাক্সওয়ালা লোকটি বলল, "এবার এদিকে দেখুন!"

লোকটি তার হাতের বাক্সটায় একটা বোতাম টিপতেই একটা আলোর রেখা গিয়ে পড়ল আর-একটা পাথরের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা এক লাফে গেল শূন্যে।

লোকটি বলল, "মানুষের চেয়েও কোনো বড় প্রাণীকে এই ভাবে আমি চোখের নিমেষে কাছে টেনে আনতে পারি কিংবা দূরে সরিয়ে দিতে পারি।"

রা জিজ্ঞেস করল, "আমার এই অস্ত্রটা আপনার বাক্সটাকে তার আগেই গুঁড়ো করে ফেলতে পারবে না বলতে চান?"

"চেষ্টা করে দেখুন।"

"তার দরকার নেই, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট!"

"এবার আপনারা দু'জনে চশমা খুলে ফেলুন।"

"না, আমরা চশমা খুলব না।"

"বুঝতে পারছেন প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই।"

ইনফ্রা রেড চশমা না পরে থাকলে এই লালগোলাপ গ্রহটিতে খালি চোখে কিছু দেখা যায় না তো বটেই, কয়েক ঘন্টা সেরকমভাবে থাকলে অন্ধ হয়ে যাবারও সম্ভাবনা। রা তা জানে।

নী রা-র বাঁ হাত চেপে ধরে বলল, "রা-দি, এই লোকগুলো নিশ্চয়ই মেঘ চোর।"

রা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। সে কোটের পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট বার করে একটা নী-কে দিয়ে বলল, "চট করে খেয়ে নে। একটু দূরে সরে দাঁড়া। খবর্দার, আমাকে আর ছুঁবি না।" অন্য লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতন। তাদের হাতে কিন্তু কোনো অস্ত্র নেই। বাক্সওয়ালা লোকটিই আবার বলল, "শুধু-শুধু সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা চলুন, আপনাদের একটা তাঁবুতে রাখা হবে, সেখানে খাবার দাবারের কোনো কষ্ট নেই। আপনাদের চশমা দুটোও আমরা একটু পরে ফেরত দেব। আপনাদের রকেটটা আমাদের চাই।

রা লোকটিকে ধমক দিয়ে বলল, "আপনারা বিপদে পড়ার ভান করে সাহায্য চেয়ে খুব অন্যায় করেছেন। ভবিষ্যতে আবার কেউ যদি বিপদে পড়ে সাহায্য চায়, আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? ভাবব, আবার কোনো বদমাস লোক মিথ্যে সাহায্য চাইছে?"

লোকটি বলল, সেরকম সুযোগই আর আপনাদের আসবে না।"

"আপনারা আমাদের রকেটটা নিতে চাইছেন। কিন্তু ঐ রকেটে আমাদের দু'জন সঙ্গী আছে। তারা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।"

"আপনাদের পুরুষরা বুঝি মেয়েদের রকেট চালাতে দিয়ে নিজেরা ঘুমোয়? বাঃ চমৎকার তো!"

"কতটা চমৎকার, তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই মনে হয়। যাই হোক, যা বলছিলাম, ওরা ঘুমিয়ে আছে ওদের জাগানো যাবে না, নামানোও যাবে না। সুতরাং তাদের সুদ্ধু আপনারা রকেটটা নেবেন কী করে?"

"সে আমরা ব্যবস্থা করব। তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই।"

"তার মানে রকেট চালিয়ে দিয়ে এক সময় ওদের আপনারা কলা কিংবা কমলালেবুর খোসা ছোঁড়ার মতন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, তাই না? আপনারা জানেন না মহাশূন্যে কোনরকম আবর্জনা ফেলা নিষেধ?"

"ভদ্রমহোদয়া, আপনি দেখছি খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন।

আমি দুঃখিত যে, আপনার সুন্দর-সুন্দর কথা শুনে সময় নষ্ট করতে পারছি না এখন। আমাদের সঙ্গে চলুন। আশা করি আমাদের জোর করতে বাধ্য করবেন না।"

"আপনারা কেন আমাদের বন্দী করছেন?"

"আমরা কে, কেন আপনাদের বন্দী করছি, এই সব ছেলেমানুষি প্রশ্ন কেন করছেন? কোনোটারই উত্তর দেব না।"

"উত্তর দিতে হবে না, আমি বলছি শুনুন। আপনারা পৃথিবীর লোক নন। প্রথম সাহায্য চাইবার সময় আপনারা রাশিয়ান ভাষা বলেছিলেন, কিন্তু আপনারা যে রাশিয়ান নন, সেটা তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। আপনারা যে এসপারান্টো বলছেন, তাও অন্যরকম। রকেটো আপনি বলছেন রকাইট, কানুনগোকে আপনারা বলছেন কানুনজা, সুন্দরকে বলছেন, ছুইণ্ডার! আপনারা শুক্রগ্রহের মানুষ, তাই না?"

শুক্রগ্রহের লোক অবশ্যই পৃথিবীর মানুষই। আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে মানুষ জয় করেছিল শুক্রগ্রহ, সেটা একুশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। শুক্রগ্রহের আলো-হাওয়া খুব খারাপ বলে প্রথমে কয়েকজন ফাঁসির আসামিকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। তারা বেঁচে যেতে, তারপর থেকে বেশ কয়েক বছর শুধু চোর-গুণ্ডা-বদমাসদের নির্বাসন দেওয়া হত শুক্রগ্রহে। ক্রমশ সেই লোকগুলোই শুক্রগ্রহে চাষবাস করে, শহর বানিয়ে খুব উন্নতি করেছে। কিছুদিন হল তারা বিজ্ঞানেও খুব উন্নতি করেছে বলে শুনেছে রা। সে অবশ্য শুক্রগ্রহে একবারও যায় নি। লোকগুলো তা হলে এতদূর এগিয়েছে যে, সূর্য-মণ্ডলের বাইরেও যেতে শিখেছে? এ খবর পৃথিবীর লোক বোধহয় এখনো জানে না।

বাক্সওয়ালা লোকটি বলল, "আপনার বুদ্ধি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। এখন চলুন তো। চশমা যদি না খোলেন, তা হলে জোর করে খুলে নিতেই হবে।"

রা ওভারকোটের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখল। ছোট রিভলভারটা সে আগেই ভরে ফেলেছে। একেবারে খালি হাতে সে বাক্সওয়ালা লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "ছি, ওরকম কথা বলে না। কোনো মেয়ের চোখ থেকে জোর করে চশমা খুলে নিতে নেই।"

রা আরও এক পা এগুতেই লোকটি বাক্সের বোতাম টিপল। তাতে রা পাথরের টুকরোটার মত আকাশেও উড়ে গেল না, লোকটির কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়েও পড়ল না। সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। রা হাসিমুখে লোকটির দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, "আপনি আমায় ধরুন তো!"

স্পেস হেলমেট পরে থাকায় লোকটি যে কত অবাক হয়েছে তা তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। তবে তার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেছে। রা-কে সে ছুঁতে সাহস কর না!

রা বলল, "আপনি আমায় ধরবেন না? কিন্তু আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তা হলে আপনাকে একবার জড়িয়ে ধরি?"

রা লোকটির কাঁধে হাত রাখতেই লোকটি বাক্স সমেত ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ল। অন্য লোকগুলোর মধ্যে দু-তিনজন ঠিক এই সময় দৌড়ে ধরতে গেল নী-কে, তাদেরও ঠিক একই অবস্থা হল। নী-র গায়ে হাত দেওয়া মাত্রই তারাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রা আর নী একটু আগে যে ট্যাবলেট খেয়েছে, তার ফলে তাদের শরীরে দারুণ শক্তিশালী বিরুদ্ধ-চুম্বকশক্তি জন্মে গেছে। কোনো জীবিত প্রাণী তাদের ছুঁতে পারবে না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে নতুন আত্মরক্ষার অস্ত্র। এতে কেউ মরে যায় না, কিন্তু উচিত শাস্তি পায়।

যে একটা মাত্র লোক রা কিংবা নী-কে ছোঁয়নি, সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু-একবার এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর দৌড়ে গেল রা-দের রকেটটার দিকে।

বাক্সওয়ালা লোকটা মাটিতে পড়ে গিয়েও চেঁচিয়ে বলল, "এস এস, শিগগির রকেটটা দখল করো।"

লোকটা রকেটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল তরতরিয়ে।

রা কিন্তু সেই লোকটাকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করল না। সে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল নিজেদের রকেটটার দিকে। শুক্রগ্রহের লোকটি ভেতরে ঢোকার একটু পরেই আঁ আঁ করে দারুণ ভয়ার্ত চিৎকার শুরু করল। তারপর চিৎকারটা এমন ভাবে থেমে গেল যে, বোঝা যায়, লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

রা বাক্সওয়ালার দিকে চেয়ে বলল, "তোমাদের ঐ বন্ধুটি আর ফিরবে না। মূর্খ, শেষ অস্ত্রটির কথা আগে কক্ষনো জানাতে নেই।"

তারপর সে নী-কে ডেকে বলল, "চল রে, নী, আমরা রকেটে ফিরে যাই।"

মাটিতে শুয়ে থাকা বাক্সওয়ালাকে রা বলল, "কী" আর একবার ছুঁয়ে দেব নাকি?

লোকটি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, না, না!"

"আমরা এখন চলে যাচ্ছি বটে, তবে চিন্তা করবেন না, আমরা আবার অবশ্যই রাষ্ট্রসংঘের পুলিশ নিয়ে ফিরে আসব। ততক্ষণ পর্যন্ত গুড লাক; আপনারা কি পৃথিবীর হিসেব জানেন? পৃথিবীর সময়ের হিসেব অনুযায়ী আর ঠিক ষোলো মিনিট পরে আপনারা উঠে দাঁড়াতে পারবেন। আচ্ছা ডাকাতবাবু, চলি এখন।"

নী একেবারে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে অত বড় বড় চেহারার লোক যখন তাকে ধরবার জন্য ছুটে এসেছিল, তখন আর একটু হলেই সে ভয়ে দৌড় মারত! লোকগুলো কী ভাবে ছিটকে পড়ল তা সে বুঝতেই পারছে না। নী ছেলেমানুষ, সে এই অস্ত্রটার কথা কিছুই জানে না। সামান্য একটি ট্যাবলেট যে অস্ত্র হতে পারে সে বুঝবে কী করে?

রা নী-র কাছে এস বলল, "শোন, তুই আগে আগে চল। ভেতরে ঢুকেই দেখবি ঐ লোকটা অজ্ঞান হয়ে আছে। ভয় পাবি না, আর খবর্দার, কোন কারণেই আমাকে ছুঁয়ে ফেলবি না কিন্তু। ভেতরে গিয়েই তুই স্নানের ঘরে ঢুকে পড়বি। সেখানে দেখেছিস তো জলের শাওয়ারের কলের পাশেই আর-একটা কল আছে? সেটা তুতে আলোর শাওয়ার। সেই আলোতে স্নান করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

নী প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে রকেটে উঠল, তারপর উঠল রা। ককপিটের কাছেই মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সেই লোকটা। সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে রা রকেটের সিঁড়ি তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, "ধন্যবাদ জিউস। জীবন সুন্দর তো?"

কমপিউটার জিউস খুব নরম বকুনির সুরে বলল, "রা, নিচে নামার আগে তোমার উচিত ছিল আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা। হ্যাঁ, জীবন সুন্দর।"

রা বলল, "ভুল হয়ে গেছে। এই নী মেয়েটা এমন তাড়াহুড়ো করল। ছেলেমানুষ তো, বড্ড আবেগপ্রবণ। তবু আমি জানতাম, আমি ভুল করলেও তোমার সাহায্য পাবই।"

"রকেট তাড়াতাড়ি চালু করে দাও রা। ওরা এক রকম গোলা ছোঁড়বার চেষ্টা করছে।"

"অদ্ভুত তো লোকগুলো! গোলা ছুঁড়ে আমাদের রকেটটা নষ্ট করে ওদের কী লাভ?"

"তুমি এন্ ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ পাঠিয়ে দাও, তাতেই ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"না, না, আমি ওদের মারতে চাই না। আমি কোনো মানুষকেই মারতে চাই না। এই লোকগুলো বোধহয় পাগল, নইলে এমন করবে কেন?"

জিউস হা হা করে হেসে উঠল। জিউস এমনিতে খুব কম হাসে।

রা ততক্ষণে রকেট চালু করে দিয়েছে। ওভারকোটটা খুলে ফেলে সে হালকা হয়ে নিল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, লালগোলাপের মেঘ ভেদ করে কতকগুলো আগুনের গোলা ছুটে আসছে। সেজন্য সে একটুও চিন্তিত হল না। ঐ গোলার একটাও তার রকেট ছুঁতে পারবে না।

রকেট চালু হবার পর আসন-বন্ধনী খুলে উঠে এসে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির পাশে দাঁড়াল। রকেট ছাড়ার সময় প্রথম ঝাঁকুনিতে লোকটি দেয়ালের গায়ে একটা ধাক্কা খেয়েছে।

রা বলল, "ইস ওর কথা খেয়াল করিনি তো!"

লোকটার একটা হাত পিঠের নিচে পড়েছে বলে নী সেটা ঠিক করে দিতে যাচ্ছিল, রা তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, "এই কী করছিস? তুই লোটাকে মারবি নাকি? এখনো আমাদের শরীর চুম্বক-বিরোধী হয়ে আছে না? যা, শিগগির স্নান করে আয়!"

দু'জনে দুটো বাথরুমে ঢুকে ঝটপট স্নান করে পোশাক বদলে বেরিয়ে এল। কড়া ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ওদের চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে।

লোকটির কাছে এসে রা নী-কে বলল, "তুই ওর পা দুটো ধর তো, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেরি হয়ে গেল!"

দু'জনে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে এল স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে। লোকটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রা বলল, "জিউস, একে একটু চটপট দেখবে?"

জিউস বলল, "তুমি ওর মাথা থেকে স্পেস-হেলমেটটা খুলে নাও।"

রা স্পেস-হেলমেটা খুলে নিয়ে দেখল, লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, গালে অল্প-অল্প দাড়ি, বাঁ চোখের ঠিক ওপরে একটা কাটা দাগ। লোকটির চুল ও দাড়ির রঙ হলদে-হলদে, তা দেখে রা অবাক হল না। শুক্রগ্রহের মানুষের চুল দাড়ির রং এ-রকম বদলে গেছে, সে আগেই শুনেছে।

দুটি রবারের হাত বেরিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল লোকটাকে।

রা আবার জিজ্ঞেস করল, "লোকটা বাঁচবে তো জিউস?"

জিউস বলল, "তুমি যখন কোনো মানুষকে মারতে চাও না, তখন ওকে বাঁচাতেই হবে।"

রবারের হাত দুটিই লোকটিকে পটাপট ইঞ্জেকশান দিতে লাগল।

একটু পরে জিউস বলল, "শোনো রা, এই লোকটি কতখানি হিংস্র, আমরা জানি না। জ্ঞান ফিরে পাবার পরই যদি ও তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? ওর গায়ে যে-রকম শক্তি, তোমরা দু'জনে তো ওর সঙ্গে পারবে না।"

"তুমিই তো রয়েছ জিউস। তুমি আমাদের রক্ষা করবে।"

"তাতে একটু অসুবিধে আছে।"

"কিন্তু লোকটা রকেটে ওঠা মাত্রই তো তুমি ওকে ঠাণ্ডা করে দিলে।"

"হ্যাঁ তখন অতিকম্পন দিয়ে আমি ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম। কম্পন আর একটু বাড়লে ওর হাত-পাগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে যেত। কিন্তু তোমরা কাছাকাছি থাকলে তো তা পারব না। সেইজন্যই আমি বলি কী, ওকে এখন ওসুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হোক।"

"কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই যে। ওরা কেন আমাদের বন্দী করে রকেটটা নিয়ে নিতে চাইছিল, তা আমি জানতে চাই।"

"তুমি জোরা করে ওর পেট থেকে কথা বার করবে ভাবছ? তা তুমি পারবে না। বরং ইউনুস জেগে উঠুক-"

"তুমি যন্ত্র হয়েও মেয়ে আর ছেলেতে কেন তফাত করো বলো তো? ইউনুস ছেলে বলেই পারবে, আর আমি মেয়ে বলে পারব না?"

"আমি সেভাবে বলিনি। তুমি রাগ করছ কেন, রা? মনের শান্তি কত দুর্লভ, তা কি যখন-তখন নষ্ট করতে আছে? শান্তি, শান্তি, শান্তি, তোমার মন শান্ত হোক।"

জিউসের গলার দুঃখের সুর পেয়ে রা তক্ষুনি বলল, "আমি অন্যায় ভাবে রাগ করেছি জিউস। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

জিউস বলল, "তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে না। সত্যিই তো আমি যন্ত্র; আমার রাগ নেই, দুঃখ নেই, হিংসা নেই, মায়া-মমতা নেই। তোমরা তো এগুলো আমায় দাওনি। মেয়ে-পুরুষের তফাতও আমি বুঝি না। আমি বলছিলাম কী, মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে দু'চোখের দৃষ্টি এক করে তার মনের কথা পড়ে ফেলার ব্যাপারে ইউনুস এক বছর ট্রেনিং নিয়েছে। তুমি তো সে ট্রেনিং নাওনি।"

"ও ঠিক তো, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তা হলে-"

রা-র কথা শেষ হল না। শুক্রগ্রহের লোকটি লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমেই নী-কে ধরে কাঁধে তুলে নিল।

তারপর রা-কে হুকুম করল, "এক্ষুনি রকেটের মুখ ঘোরাও। আমরা লালগোলাপে ফিরে যাবে।"

ব্যাপারটা একেবারে চোখের নিমেষে ঘটে গেল। জিউসের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে রা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লোকটার জ্ঞান নিশ্চয়ই আগেই ফিরে এসেছে, এতক্ষণ ওদের কথা শুনেছে।

নী ছটফট করছে, কিন্তু লোকটির গায়ে দারুণ শক্তি। শক্ত করে চেপে ধরে আছে নী-কে।

জিউস বলল, "আমি এই ভয় পাচ্ছিলাম।"

লোকটি বলল, "আমার কোনো ক্ষতি করবার চেষ্টা করলেই এই মেয়েটিকে আমি আগে মেরে ফেলব। এক্ষুনি ককপিটে চলো, রকেট ঘোরাতে হবে।"

রা গম্ভীরভাবে বলল, "আমি জানি আপনার নাম এস। জীবন কী-রকম শ্রীযুক্ত এস?"

লোকটি বলল, "ওসব তোমাদের পৃথিবীর ন্যাকামি-কথা ছাড়ো। চলো ককপিটে।"

রা হাত তুলে লোকটিকে আদেশ দিল, "আপনি ঐ মেয়েটিকে নামিয়ে দিন। আর ভদ্রভাবে কথা বলুন, শ্রীযুক্ত এস!"

এর উত্তরে লোকটি ঘরের দেয়ালে ঠকাস করে নী-র মাথাটা ঠুকে দিয়ে বলল, "এই দেখলে? আর-এক ঠোকায় এর মাথাটা ছাতু করে দিতে পারি। যদি এই মেয়েটিকে বাঁচাতে চাও, তবে আমার হুকুম মানতে তোমরা বাধ্য।"

নী চেঁচিয়ে বলল, "রা-দি, ও আমায় মেরে ফেলুক তবু তুমি ওর কথা শুনো না!"

লোকটা দড়াম করে লাথি দিয়ে হাসপাতাল ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে।

জিউস বলল, "রা, দ্যাখো, তোমরা বিজ্ঞানে এত উন্নতি করছ, তবু শেষ পর্যন্ত মানুষের গায়ের জোরেই জিতে যাচ্ছে।"

রা বলল, "তুমি নজর রাখো, জিউস। ও কোনো-না কোনো ভুল করবেই। গায়ের জোর নয়, শেষ পর্যন্ত জেতা যায় মনের জোরে।"

রা-ও হাসপাতাল-ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নী-কে কাঁধে চেপে ধরে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ককপিটের সামনে। রা-কে দেখে সে বলল, "অতিকম্পন দিয়ে আমাদের দু'জনকেই মাটিতে ফেলে অজ্ঞান করার চেষ্টা যদি করো, তাহলে প্রথম ঝাঁকুনি লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমি মেয়েটাকে মেরে ফেলব। তারপর আমার যা হয় হোক।"

নী লোকটির একটা কান কামড়ে ধরল।

লোকটি যন্ত্রনায় দু'বার আ আ চিৎকার করেই রাগে গর্জন করে রা-কে বলল, শিগগির ওকে বারণ করো। নইলে আমি এক্ষুনি ওকে শেষ করে দেব!"

রা বলল, "নী, ওরকম করে না! ছেড়ে দে! ও যতই অসভ্যতা করুক, তা বলে আমরা করব কেন!"

নী ওর কান ছেড়ে দিতেই লোকটি তাকে নামিয়ে নিজের সামনে রেখে কাঁধ দুটো শক্ত করে চেপে ধরে রইল। লোকটির পিঠ দেয়ালের দিকে।

ককপিটের ওপরের দিকে বিপ বিপ শব্দ হতে লাগল। বাইরে থেকে কোনো খবর এসেছে।

লোকটি বলল, "ফোন ধোরো না! রকেটের মুখ ঘোরাও।"

রা বলল, "অত চেঁচিয়ে কথা বলার দরকার নেই। আমরা লালগোলাপেই ফিরে যাচ্ছি!"

রা নিজের আসনে বসে কয়েকটা বোতাম টিপল।

লোকটি বলল, "আমার সঙ্গে চালাকি করো না। অন্য কোনো দিকে গেলে আমি ঠিক বুঝতে পারব! তুমি স্ক্যানার দেখাও, কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাচ্ছ, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

রা বলল, "মূর্খ, আমি লালগোলাপে যাবার নাম করে যদি তোমাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস-স্টেশন নং একুশে নিয়ে যাই, তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। এই রকেটের স্ক্যানার দেখে বুঝতে পারে, এমন লোক মাত্র তিনজন আছে। কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলি না। তোমরা পৃথিবী থেকে অনেকদিন আগে শুক্রগ্রহে চলে গেছ বলে, আগেকার পৃথিবীর মানুষদের খারাপ দোষগুলো ভুলতে পারোনি। ঐ দ্যাখো লালগোলাপ!"

ককপিটের সামনের কাচে লালগোলাপ উপগ্রহের এক হাজার গুণ বড় করা ছবি ফুটে উঠল। সেটা ক্রমশ আরও বড় হচ্ছে।

লোকটির মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, "কতক্ষণের মধ্যে পৌঁছোব?"

রা ঘড়ি দেখে বলল, "ধরো, আর পনের মিনিট।"

নী ব্যাকুলভাবে বলল, "রা-দি, তুমি কি করছ? ওরা আমাদের রকেটটা কেড়ে নিয়ে লালগোলাপে আমাদের ফেলে রেখে পালাবে। তাতে তো আমরা এমনিই মরব! তার চেয়ে বরং আমি একলা মরি। তারপর তুমি এই লোকটাকে শাস্তি দিও।"

রা বলল, "মরা কি অতি সহজ নাকি? সুন্দর এই জীবন, সময় ফুরোবার আগে কেন এই জীবন নষ্ট হবে?'

আর তখনই রকেটের আর একটা চেম্বারে ঝিনঝিন ঝিনঝিন করে বেজে উঠল একটা ঘড়ির অ্যালার্ম। আওয়াজটা খুব জোর নয়। কিন্তু রা শুনতে পেয়েছে ঠিক।

। ৫ ।

পৃথিবীর হিসেবে আঠাশ দিন, আর মহাকাশের হিসেবে একদিন পর ঘুম ভাঙল ঝিলমের। ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে তার ঘুম ভাঙাবার জন্য নয়, অন্যদের জানাবার জন্য। ট্যাবলেট খাওয়া ঘুম কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে ভাঙে।

চোখ মেলে ঝিলম এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু অবাক হল। রা পাশে নেই কেন? হাত দিয়ে কাচের ডালাটা ঠেলে তুলল সে।

মহাশূন্যে অনেকদিন ঘুরে বেড়ালেও মানুষের শরীর এখনো পৃথিবীর নিয়মে চলে। এতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলেই খিদে পায় খুব, শরীর দুর্বল লাগে। সেইজন্যই গ্লুকোজ মেশানো কমলালেবুর রস নিয়ে একজন কারুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ম। উঠে বসতেই ঝিলমের মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে উঠল, আর তখনই কে যেন তার কানের পাশে ফিসফিস করে বলল, "সুপ্রভাত, ঝিলম।"

ঝিলম বলল, "সুপ্রভাত, জিউস। জীবন সুন্দর তো?"

জিউস বলল, "ততটা সুন্দর বলতে পারছি না। এই রকেটে অন্য একজন লোক আছে,...... সে তোমাদের সকলকে বন্দী করবার জন্য লালগোলাপ উপগ্রহে নিয়ে যাচ্ছে।

"অ্যাঁ?"

উত্তেজিত হয়ো না। উঠে দাঁড়িয়ো না। এক্ষুনি উঠলেই তুমি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আমি দুঃখিত। আমার হাত অত বেশি লম্বা নয় বলে তোমাকে ফলের রস পৌঁছে দিতে পারছি না। একটু বিশ্রাম নাও।"

সেই কাচের বাক্সের মধ্যেই বসে থেকে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "রা, আর নী কোথায়?"

"সেই লোকটা ওদের আটকে রেখেছে!"

"তুমি কী করছ? তোমাকে তো আটকে রাখেনি। তুমি ঐ একটা মাত্র লোককে"

"এ ক্ষেত্রে আমি অসহায়।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝিলম উঠে দাঁড়াল।

জিউস বলল, "আর-একটু থাকো, আর একটু বিশ্রাম নাও, সময় হলে আমি বলে দেব-"

"আমি ঠিক আছি।"

কাচের বাক্সটার বাইরে বেরিয়ে এসে ঝিলম প্রায় টলতে-টলতে চলে এল পাশের রান্নাঘরে। ঘুম থেকে উঠে ঝিলম ফলের রস, তারপর টোস্ট, সাসজ, সমুদ্র-শ্যাওলার সালাড আর তিমি মাছের কেক খেতে ভালবাসে। এখন সে খুব তাড়াতাড়ি এক ঢোক ফলের রস, কয়েকখানা বিস্কিট আর গোটা ছয়েক নিউট্রিশন ট্যাবলেট খেয়ে নিল। রকেটের সব জায়গাতেই কথা বলার টিউব আছে, জিউস এখানেও ফিসফিস করে তাকে সব ঘটনাটা শুনিয়ে যাচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে, ঘুম-ঘরে আবার ঢুকে ঝিলম একটা পোশাকের ওয়ার্ডরোব খুলল। সেখানে কিছু পোশাক আর জুতো সাজানো। জুতোগুলোর মধ্যে ব্যস্তভাবে খুঁজতে লাগল ঝিলম, কিছুতেই যেন পছন্দমতন জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছে না।

জিউস বলল, "জুতোর জন্য তুমি সময় নষ্ট করছ, ঝিলম? এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান!"

ঝিলম তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, "বিপদে পড়লে দেখছি তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যায়, জিউস! সব দিক চিন্তা করতে ভুলে যাও! মনে হচ্ছে তোমার একবার ওভারহলিং দরকার।"

এই রকেটে একমাত্র ঝিলমই জিউসকে ধমকে কথা বলতে পারে। ঠিক জুতো-জোড়া খুঁজে পেয়ে পরে নিতে-নিতে ঝিলম একবার ইউনুসের দিকে তাকাল। ইউনুসের ঘুম ভাঙতে আরও কয়েকদিন দেরি আছে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে ককপিট দেখা যায়। ককপিটের সামনে অনেকখানি লম্বা জায়গা। ঝিলম দেয়াল ধরে-ধরে একটু-একটু করে এগোতে লাগল, যেন পা ফেলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

ঝিলমের বয়েস তেইশ, গায়ের রং কুচকুচে কালো, সে খুবই সুপুরুষ। সাদা ট্রাউজার্স আর হাতকাটা সাদা গেঞ্জি পরে আছে সে, তার সঙ্গে খুবই বেমানান টুকটুকে লাল রঙের জুতো। খুবই জোর করে পা টেনে-টেনে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে।

রা এদিকেই তাকিয়ে ছিল। ঝিলমকে দেখেও একটা কথা বলল না।

নী উত্তেজনা দমন করতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, "ঝিলমদা, চলে যাও, শিগগিরই চলে যাও?"

দেয়ালে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগল ঝিলম।

এস নামের লোকটি ঝিলমকে দেখে নী-কে আবার শক্ত করে চেপে ধরে বলল, "কোনোরকম ছেলেমানুষি চেষ্টা করে লাভ নেই। আমরা এক্ষুনি লালগোলাপে নামছি।"

ঝিলম লোকটির কথা একেবারেই গ্রাহ্য না করে রা-র দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "রা, আমি এই রকেটের কমাণ্ডার হিসেবে বলছি, এক্ষুনি এই রকেটের ট্রাজেকটরি বদলাও। আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্পেস স্টেশন নং ২৭-এ যাব। গড স্পীড।"

এস রা-কে বলল, "রকেটের গতি পালটালে এই মেয়েটির কী দশা হবে তা তুমি ভাল করেই জানো!"

রা একবার ঝিলমের দিকে আর একবার এস-এর দিকে তাকাল।

ঝিলম বলল, "রা, আমার হুকুম শুনতে পাওনি?"

রা ঝিলমকে বলল, "কমাণ্ডারের হুকুম আমি মানতে বাধ্য।"

এস ঝিলমের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, এই খোকাটি দেখছি ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না। এখানে রক্তপাত হোক, ও চায়?"

রকেটের মুখটা তক্ষুনি যে বেঁকে গেল, তা বুঝতে কারুরই অসুবিধে হল না। সামনের স্ক্রীন থেকে লালগোলাপের ছবি সরে গেল।

এস নী-কে উঁচুতে তুলে দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "এই মেয়েটাকে আছড়ে আমি ঐ মেয়েটাকে মারব। আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে রকেট যদি লালগোলাপের দিকে না ফেরে—"

ঝিলম বলল, "গুনবার দরকার নেই, তুমি ঐ মেয়ে দুটিকে মারো। আমি সেই দৃশ্যটা দেখতে চাই।

ঝিলম দেয়াল থেকে হাত তুলে নিতেই স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে চোখের পলক ফেলার আগেই এস্ নামে লোকটির ওপরে গিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তি বিশেষ হল না, তার আগেই ঝিলম নী-কে ছাড়িয়ে নিয়েছে। তারপর এস-এর চিবুকে পরপর ঘুঁষি মেরে চলল সে।

রা উঠে এসে বলল, "ঝিলম, এবার ছেড়ে দাও। হাজার হোক, মানুষ তো? মরে যাবে যে লোকটা!"

লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে।

জোরে-জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ঝিলম বলল, "এই বদমাসটা নী-কে কষ্ট দিয়েছে বলেই আমার অত রাগ হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলে বোধহয় ওকে আমি একেবারে শেষ করেই ফেলতাম!"

পা থেকে লাল জুতোজোড়া খুলে ফেলে ঝিলম নী-র দিকে চেয়ে বলল, "তোমার বেশি লাগেনি তো, নী?"

নী বলল, "না, ঝিলমদা! উঃ, তোমার গায়ে কী জোর! অতবড় চেহারার লোকটাকে তুমি ঘুষি মেরে ঠাণ্ডা করে দিলে? অত জোরে তুমি লাফ দিলেই বা কী করে?"

ঝিলম বলল, "ওসব কথা পরে হবে। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমার জন্য খাবার তৈরি করে আনবে?"

রা বলল, "আমি তোমার জন্য খাবার এনে দিচ্ছি, ঝিলম। ততক্ষণ তুমি কন্ট্রোলে বসো।"

ঝিলম উঠে দাঁড়াতেই কমপিউটার জিউস জানাল, "এই লোকটি কিন্তু অজ্ঞান হয়নি। চোখ বুজে অজ্ঞানের ভান করে আছে।"

ঝিলম বলল, "ওর হাত দুটো বেঁধে রাখা দরকার, যাতে হঠাৎ কোনো পেজোমি করতে না পারে আবার। রা, দড়ি-টড়ি কিছু আছে?"

রা হাসিমুখে বলল, "দড়ি কোথায় পাব? রকেটে কখনো দড়ি লাগবে ভেবেছি নাকি?"

নী বলল, "আসবার সময় মা আমাকে যে কেকের বাক্সটা দিয়েছিলেন, সেটা একটা সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল না?"

ঝিলম বলল, "সেটা ফেলে দাওনি তো? দ্যাখো তো সেটা অ্যালয় সুতো কি না!"

নী সুতোটা খুঁজে নিয়ে এল। খুব সরু সুতো, অনেকটা ঘুড়ি ওড়াবার সুতোর মতন, কিন্তু তাতে চার-পাঁচ রকমের রং। ঝিলম সুতোটা হাতে নিয়ে বলল, "বাঃ, এতেই কাজ চলবে। এই অ্যালয় সুতো কোনো গোরিলাও ছিঁড়তে পারে না।"

ঝিলম সুতোটা নিয়ে কাছে যেতেই লোকটা ধড়মড় করে উঠে বসল।

ঝিলম বলল, "আশা করি তুমি আবার আমায় ঘুষি মারতে বাধ্য করবে না! হাত দুটো উঁচু করো, আমি এই সুতোটা বেঁধে দেব।"

লোকটি বলল, "বাঁধবার দরকার নেই, আমি আর কিছু করব না।"

ঝিলম বলল, "তোমায় আমি বিশ্বাস করি না। যে একটা ছোট মেয়েকে তুলে আছাড় মারতে যেতে পারে, সে মানুষ নয়, অমানুষ।"

লোকটির হাত দুটো পিঠের দিকে নিয়ে সেই সরু সুতোটা দিয়ে বেঁধে ফেলল ঝিলম। তারপর তার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোল বল বার করে আনল।

ঝিলম বলটা নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, "বিচ্ছিরি জিনিস! এ-রকম একটা জিনিস কেউ পকেটে ভরে রাখে?"

ঐ গোল বলটা একটা গ্রীনেড! সামান্য একটা টেনিস বলের মতন হলেও ঐ একটা গ্রীনেড দিয়েই এই রকেটটা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

জিউস বলল, "ওটা হাতে রেখো না, ঝিলম। এক্ষুনি ওটা জলে ডুবিয়ে দাও।"

ঝিলম বলল, "জানি।"

বাথরুমে ঢুকে ঝিলম সেই বলটাকে সিঙ্কে ডুবিয়ে রেখে এল। তারপর কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে চেয়ার নিয়ে বসতেই রা একটা প্লেটে সাজিয়ে খাবার এনে দিল তাকে।

ঝিলম বলল, "চমৎকার! এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তো!"

রা চমকে উঠে বলল, "সে কী! এখন আমি ঘুমোব?"

ঝিলম বলল, "নিশ্চয়ই? তোমার সময় হয়ে গেছে।"

রা মিনতি করে বলল, "না, এখন আমার একটুও ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না! এই লোকটাকে জেরা করতে হবে।"

"সে আমি করব। তোমার এখন জেগে থাকা চলবে না।"

"আমার বদলে নী ঘুমোতে যাক বরং।"

"ইউনুস জেগে উঠলে নী ঘুমোতে যাবে। ইউনুসের আর বেশি দেরি নেই।"

"একটা দিন না ঘুমোলে কী হয়?"

"তোমার আঠাশ দিন বয়েস বেড়ে যাবে। আমরা আর যাই পারি, হারানো সময়কে কিছুতেই ফিরে পেতে পারি না। লক্ষ্মীটি, যাও!"

রা আর তর্ক করল না। ঘুমের ঘরে গিয়ে কাচের বাক্সটা খুলে একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ল।

নিজের খাবার শেষ করতে-করতে ঝিলম বলল, "নী, আমার পাশে এসে বসো। আমি যতক্ষণ খাই, ততক্ষণ তুমি একটা কবিতা শোনাও তো।"

নী বলল, "বেড়ালের মতন চেহারার একটা ধূমকেতু দেখে আমি একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তারপর এমন সব কাণ্ড হল যে, সেটা ভুলে গেলুম!"

"যাঃ! কবিতাটা হারিয়ে গেল? খুব দুঃখের কথা।"

"লালগোলাপে লোকগুলো যখন আমাদের ঘিরে ধরেছিল, তখন সত্যিই আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। রা-দি কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তুমি তো জানো না ঝিলমদা, এর আগেও কী একটা দারুণ কাণ্ড হয়েছিল। আমি একটা মেঘে সাঁতার কাটতে নেমেছিলুম—"

নী তখন মেঘ চুরির ঘটনাটা শোনাল।

ঝিলম খাবার শেষ করে কন্ট্রোল বোর্ডের অনেকগুলো বোতাম টিপতে লাগল টপাটপ করে। তারপর গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, মহাশূন্য স্টেশন নং চোদ্দতে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে, জিউস?"

"তিন ঘন্টা এগারো মিনিট সাত সেকেণ্ড!"

"চমৎকার!"

চেয়ারটা হাত-বাঁধা লোকটির দিকে ঘুরিয়ে ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "এবার তোমার গানটা শোনাও।"

লোকটি বললো, "গান? আমিতো গান জানি না!"

ঝিলম বলল, "যা জানো তাতেই হবে। শুরু করো, শুরু করো!"

"সত্যিই আমি গান জানি না!"

"তোমার গলায় যে সুর নেই, তা তো বুঝতেই পারছি। তোমার কাছ থেকে কি আমি ওস্তাদি গান শুনতে চাইছি? তোমার মাথার হলদে চুলই বলে দিচ্ছে তুমি শুক্রগ্রহের মানুষ। তোমরা তো বেশ উন্নতি করেছ শুনেছি। সূর্যমণ্ডলের বাইরে এসে তোমরা রকেট চুরি করতে শুরু করলে কেন?"

"বললাম তো, আমি কোনো গান জানি না।"

"আমার কাছে এমন যন্ত্র আছে, যা একবার তোমার গায়ে ছোঁয়ালে শুধু গান কেন তুমি তিড়িং-তিড়িং করে নাচতেও শুরু করবে। কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করতে চাই না।"

"আমাকে মেরে ফেললেও আমার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুবে না।"

"এর মধ্যে মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন? তোমায় মারব কেন? তোমরা বুঝি এখনো কথায়-কথায় মানুষ মারো?

লোকটি ঝিলমের দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। আর কোনো কথা বলল না।

ঝিলম হেসে উঠল হো হো করে।

নী বলল, "ঝিলমদা, লোকটার চোখ দুটো দ্যাখো। তাকালেই কী রকম গা ছমছম করে।"

ঝিলম বলল, "আজ থেকে সাত-আট দিন পরে দেখো, ওর সব কিছু বদলে যাবে। ওর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে যাবে, লোকের সঙ্গে মিষ্টি ভাবে কথা বলবে, কারুকে খুন করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না।"

"লোকটা হঠাৎ এরকম বদলে যাবে?"

"হ্যাঁ। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকগুলো এলাকা আছে জানো তো? তার মধ্যে ৪৭ নং এলাকাটা অপারেশান করে বদলে দিলেই ও একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাবে।"

ঝিলম লোকটিকে আবার বলল, "তুমি বুঝি ভাবছ, তুমি চুপ করে থাকলেই তোমার কথা আমরা জানতে পারব না? দাঁড়াও না, ইউনুস জেগে উঠুক, তখন দেখবে কী মজা হয়!"

ঝিলম টেলিফোনটা হাতে নিতেই নী বলল, "রা-দি রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল। পারেনি। লাইন জ্যাম হয়ে ছিল।"

ঝিলম বলল, "জিউস, দেখো তো এখন পাওয়া যায় কিনা!"

জিউস উত্তর দিল, "ট্রাজেকটরি বদলাবার পর তরঙ্গ পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

টেলিফোনে ওদিক থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসতেই ঝিলম বলল, "হ্যালো, কে, রাইন? আমি ঝিলম বলছি। জীবন কী রকম?

রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস স্টেশন চোদ্দ থেকে রাইন বলল, "প্রত্যেকদিন জীবনটা যেন বেশি ভাল মনে হচ্ছে, ঝিলম। অনেকদিন পর তোমার গলা শুনলুম। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ, রাইন। ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমাদের রকেটে একটা পাখি আটকা পড়েছে।"

"তাই নাকি? কোন দেশের পাখি?"

"যতদূর মনে হচ্ছে, শুক্রগ্রহের!"

"ওর ডানা দুটো ছেঁটে ওকে আবার আকাশে উড়িয়ে দাও!"

"ডানাদুটো ছাঁটার ভার তোমাদের নিতে হবে। আমার কাছে কাঁচি নেই।"

"শুক্রগ্রহের লোকদের ডানা ছাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে। জানো তো, আমার এক কাকা শুক্রগ্রহে গিয়ে কী রকম অদ্ভুতভাবে বদলে গেলেন। মাঝখানে একবার এখানে এসেছিলেন, আমায় দেখে চিনতেই পারলেন না।"

"ঠিক আছে, সে তুমি দেখো। শোনো, দুটো কাজ করতে হবে। আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছি। আমাদের জন্য দুটো ঘর বুক করে রাখো। আর ঝটিকা বাহিনীর দফতরে খবর দাও লালগোলাপ-উপগ্রহে কিছু উদ্ভূত ব্যাপার শুরু হয়েছে। ওরা যেন খবর নিতে শুরু করে।"

"লালগোলাপটা কোথায়?"

"তুমি আকাশ-মানচিত্রে খুবই কাঁচা, আমি জানি, রাইন। তুমি ঝটিকা-দফতরে খবর দাও, ওরা ঠিক বুঝতে পারবে। ছেড়ে দিচ্ছি, আনন্দে থেকো, রাইন!"

"তোমার আনন্দ আরও বেশি হোক। একটু পরে দেখা তো হচ্ছেই, তখন এক সঙ্গে দু'জনে আনন্দ করা যাবে।"

টি-রি-রি-রি করে অ্যালার্ম বেজে উঠতেই ঝিলম বলল, "এবার তোমার পালা, নী। ইউনুসের জন্য খাবার নিয়ে যাও। তারপর চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ো।"

নী বলল, "ইশ, এই সময় কারুর ঘুমোতে ইচ্ছে করে?"

ঝিলম বলল, "দেরি করো না, চটপট চলে যাও। আর শোনো, আগে ইউনুসকে কিছু বোলো না। ওকে চমকে দিতে হবে। তুমিও এই কথা শুনে রাখো জিউস!"

নী চলে যাবার পর লোকটা মুখ তুলে হিংস্র গলায় বলল, "তোমরা আগুন নিয়ে খেলছ! আমার কোনো ক্ষতি করলে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ভাল চাও তো এখনো আমাকে লালগোলাপে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।"

আবার হেসে উঠল ঝিলম।

।।৬।।

ইউনুস যে নিঃশব্দ-বড়ি খেয়ে কথা বলা এবং কানে শোনার ক্ষমতাকেও ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তা ঝিলমের মনে ছিল না। একটু বাদে গ্লুকোজ আর অন্যান্য খাবার খেয়ে ইউনুস যখন ককপিটে এল তখন ঝিলম তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

হাত বাঁধা একটা অচেনা লোককে মেঝেতে বসে থাকতে সে দারুণ অবাক হয়ে গেল চোখ দুটি অনেক বড় করে ঝিলমের দিকে তাকাল সে।

ইউনুসও পরে আছে সাদা প্যান্ট ও গেঞ্জি। ঝিলমের গায়ের রং কুচকুচে কালো, ইউনুসের ফর্সা। সেইজন্য ঝিলমকে একটু একটু হিংসে করে ইউনুস। প্রায়ই সে তেল মেখে রোদে শুয়ে থাকের রং কালো করবার জন্য। ইউনুসের মাথার চুল কোঁকড়া।

ঝিলম বলল, "দ্যাখো তো ইউনুস, এই পাখিটিকে চিনতে পারো কিনা?"

ইউনুস এ-কথা শুনতেও পেল না, কিছু বুঝতেও পারল না।

ঝিলম আবার বলল, "এই পাখিটি বলছে ও গান জানে না। ওর মনের মধ্যে যে গানটা গুনগুন করছে, সেটা তুমি গেয়ে শুনিয়ে দাও তো!"

ইউনুস এবার এগিয়ে এসে ঝিলমের পিঠে খুব জোরে একটা কিল মারল।

ঝিলম বলল, "আরে, আরে, আমায় মারছ কেন? মারতে হয় তো ঐ লোকটাকে মারো। ঐ লোকটা নী-কে কত কষ্ট দিয়েছে জানো?"

ইউনুস আবার কিল মারবার জন্য হাত তুলল।

ঝিলম বলল, "এ কী, এই কি ঠাট্টার সময়?"

ইউনুস হঠাৎ পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেল। ফিরে এল একটা স্লেট ও পেন্সিল নিয়ে। তাতে বড় বড় করে লিখল, "কী ব্যাপার?"

ঝিলম বলল, "ও, তাই তো? তুমি এখন বোবা আর কালা। ভুলেই গিয়েছিলাম। যাঃ, এখন কী হবে? তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন, জিউস?"

জিউস উত্তর দিল, "তুমিই ওর সঙ্গে মজা করতে চাইছিলে, তাই কিছু বলিনি!"

ইউনুসের হাত থেকে স্লেট-পেনসিল নিয়ে ঝিলম খসখস করে লিখে যেতে লাগল। ইউনুস পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়তে-পড়তেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন-ঘন।

লেখাটা শেষ হওয়া মাত্র সে ছুটে গিয়ে জোরে একটা চড় কষাল হাত-বাঁধা লোকটির গালে।

ঝিলম তাড়াতাড়ি স্লেটের উল্টো পিঠে লিখল, "বন্দীকে মারতে নেই।" উঠে গিয়ে ইউনুসের চোখের সামনে সেই লেখাটা দেখাল। তারপর সব লেখা মুছে দিয়ে ইউনুসের হাতে স্লেট-পেন্সিল তুলে দিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটার সামনে বসে পড়তে।

ইউনুস লোকটির থেকে এক হাত দূরে বসে পড়ে লোকটির মুখের দিকে তাকাল। লোকটি অমনি চোখ বুঁজে ফেলে, মাথা নিচু করে চিবুকটা বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখল। ঝিলম জোর করে ওর মুখটা আবার উঁচু করবার চেষ্টা করল, কিন্তু এভাবে তো চোখ খোলানো যায় না।

ইউনুস স্লেটে লিখল, "শুক্রগ্রহের মাউন্ট অলিভের লোক···· পেশায় ডাক্তার·····লালগোলাপ·····নাঃ, এভাবে পারছি না··· আমার অসুবিধে হচ্ছে···· ওষুধ খেয়ে আছি বলে আমার ঐ ক্ষমতাটা কাজ করছে না····"

ঝিলম বলল, "থাক, ছেড়ে দাও। এক্ষুনি তো আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্পেস স্টেশনে পৌঁছে যাব।"

ইউনুস তবু সেখানে বসে রইল। তার খুব আফসোস হচ্ছে। এই রকম সময়েও সে ঝিলমকে সাহায্য করতে পারছে না।

ঝিলম ফিরে গেল কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই স্টেশনটির ডাকনাম আর্মস্টং, সেটাকে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় ঠিক একটা পুরনো কালের দুর্গের মতন, যদিও ইট-পাথর কিছুই নেই। সব কিছুই ফাইবার কাচ দিয়ে তৈরি। আগেকার কালের ইংরেজিতে কোনো অসম্ভব জিনিসকে বলত "বিল্ডিং কাসল ইন দা এয়ার"। সেটাই যেন এখন সম্ভব হয়েছে। মহাশূন্যে ভাসছে একটা দুর্গ।

আর্মস্টংয়ের সঙ্গে সিগন্যাল-বিনিময় শুরু করে দিল ঝিলম। রাইন জানাচ্ছে যে, সব ঠিকঠাক আছে। ঝিলমকে ঢুকতে হবে তিন নম্বর দরজা দিয়ে।

ঝিলম নামতে-নামতেই দেখতে পেল ঝটিকা-বাহিনীর প্রায় তিরিশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। কয়েকজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে তৈরি। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তারা ভেতরে উঠে এল।

ঘুমন্তরা রা আর নী-র কাচের বাক্স দুটি স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল কয়েকজন। ঝটিকা-বাহিনীর লোকেরা প্রায় চ্যাং দোলা করে নামিয়ে নিল হাত-বাঁধা শুক্রগ্রহের লোকটিকে। চোখের নিমেষে তাঁরা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাইন এগিয়ে এসে ঝিলমকে জড়িয়ে ধরে বলল, "জীবনটা চমৎকার না, ঝিলম?"

ঝিলম বলল, "বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে আরও চমৎকার হয়।"

রাইন এবার ইউনুসকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা, ইউনুস!"

ঝিলম বলল, "আমাদের এই বন্ধুটি এখন বোবা-কালা। ওর কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না।"

রাইন বলল, "বোবা-কালা হবার আর সময় পেল না? ভেবেছিলাম জমিয়ে আড্ডা দেব!"

ঝিলম বলল, "আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে তো?"

রাইন বলল, "হ্যাঁ, আছে; তোমরা গিয়ে আধ ঘন্টা বিশ্রাম নাও। তারপর তুমি জেনারাল লী পো'র সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

ঝিলম অবাক হয়ে বলল, "জেনারাল লী পো? তিনি এখানে?"

রাইন বলল, "তুমি যে-ব্যাপারে আমাদের খবর দিলে, ঠিকই সেই ব্যাপারেই খোঁজ নিতে জেনারাল লী পো এখানে এসেছেন।"

জেনারাল লী পো জাপানের বিখ্যাত সেনাপতি। মাত্র এক বছর হল তিনি শান্তি-সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছেন। তাঁর হেড কোয়ার্টার মঙ্গল গ্রহে।

রাইনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঝিলম ইউনুসকে নিয়ে মনো-রেলে গিয়ে উঠল। ছোট্ট একটা ট্রেন সমস্ত জায়গাটা ঘুরে-ঘুরে যায়। এখানে এক জায়গায় হোটেলের মতন সারি-সারি ঘর আছে, মহাকাশ-যাত্রীরা মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য এখানে আসে। ঘরগুলো হালকা নীল রঙের কাচ দিয়ে তৈরি, অদৃশ্য জায়গা থেকে সব সময় খুব হালকাভাবে বাজনা বাজে। ইচ্ছেমতন প্রত্যেক ঘরে সেই বাজনা বদল করা যায়, আবার থামিয়েও দেওয়া যায়।

ঘরে ঢুকে বিরাট তুলোর বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে ঝিলম বলল, "আঃ!" ইউনুস অবশ্য সে-শব্দটুকুও উচ্চারণ করতে পারল না। নী আর রা-কে কাচের বাক্স থেকে বার করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের ঘরের বিছানায়। এখানকার আবহাওয়া খুব আরামের। একতলায় আছে বিরাট বড় কাফেটেরিয়া, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের খাবার পাওয়া যায়।

ঠিক আধ ঘন্টা বাদে ঝিলম অন্যদের হোটেলে রেখে একা গেল জেনারাল লী পো'র সঙ্গে দেখা করতে। গত শতাব্দীতে যিনি প্রথম চাঁদে পা দিয়েছিলেন, সেই নীল আর্মস্টং-এর একটা মূর্তি বসানো আছে একটা বাড়ির সামনে। সেই বাড়িতেই এখানকার ঝটিকাবাহিনীর অফিস।

এর পরেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। রোবো দিয়ে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব কিছু না।। রোবো তো আর ঘুমোবে না। তাছাড়া কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকতে পারে। সেই জন্য এবার অন্য চারখানি রকেট থেকে খুব গোপন ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ ছাড়া হতে লাগল। এই তরঙ্গে সমস্ত জানাশোনা যন্ত্র বিকল হয়ে যায়।

এর পরও ওদের কাছে অজানা কোনো যন্ত্র বা অস্ত্র থাকতে পারে। কিন্তু সেটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

জেনারাল লী পো এবার নামবার হুকুম দিলেন।

ধোঁয়া কেটে যাবার পর দেখা গেল লালগোলাপের এখানে সেখানে অনেকগুলো রকেট পড়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। প্রত্যেকটি রকেট ঘুরে দেখা হল, দেখলেই বোঝা যায়, সেই রকেটগুলো বেশ কিছুদিন চালানো হয়নি।

ঝিলম বলল, "আমি বলেছিলাম, ওরা আগেই পালাবে?"

লী পো বললেন, "কিন্তু রকেট চুরি যদি ওদের মতলব হয়, তাহলে এতগুলো রকেট ফেলে গেল কেন?"

"এখানে যে ওরা ঘাঁটি গড়েনি, তা বোঝাই যাচ্ছে।"

চশমা পরার অভ্যেস নেই বলে জেনারাল লী পো তাঁর চোখ থেকে ইনফ্রা রেড চশমাটা খুলে ফেললেন অন্যমনস্কভাবে।

ঝিলম বলল, "চশমা খুলে রাখবেন না, ওটা বিপজ্জনক।"

লী পো বললেন, "রকেটগুলো সবই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, তা লক্ষ্য করেছ? একটাও শুক্রগ্রহের নয়। অর্থাৎ পৃথিবীর অভিযাত্রীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে টেনে এনেছিল ঐ ডাকাতগুলো। তোমার স্ত্রীর মতন যারা চালাক নয়, তারা আর পালাতে পারেনি। তাহলে সেই লোকগুলো গেল কোথায়? ডাকাতরা তাদের ধরে নিয়ে গেল আর রকেটগুলো ফেলে গেল? এ তো বড় আশ্চর্য কথা! তুমি কী বলো ঝিলম?"

ঝিলম একটু চিন্তা করে বলল, "আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। শুক্রগ্রহের লোকেরা মানুষ চুরি করবে কেন? ওদের তো মানুষের অভাব নেই।"

এই সময় দূর থেকে কয়েকজন উত্তেজিতভাবে ডাকতে লাগল, "জেনারাল, জেনারাল, এদিকে আসুন!"

লী পো বললেন, "ওরা কিছু দেখতে পেয়েছে। চলো, ওদিকে যাই।"

লালগোলাপ উপগ্রহটা পৃথিবীর চেয়ে তো বটেই, চাঁদের চেয়েও অনেক ছোট। এখানকার পাহাড়গুলোও বেঁটে-বেঁটে। একটা পাহাড়ের ওপর উঠলেই গোলাপের পাপড়ির মতন মেঘ গায়ের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। মেঘগুলো এত নিচু বলেই এখানে একটু দূরের জিনিস হলেই আর দেখা যায় না।

লী পো আর ঝিলম কিছুটা এগিয়ে এসে দেখল একটা ছোট পাহাড়ের সামনে ঝটিকা বাহিনীর দশজন সৈনিক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন ক্যাপ্টেন কয়েক পা এগিয়ে এসে স্যালুট করে বলল, "এই পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে, জেনারাল!"

জেনারাল জিজ্ঞেস করলেন, "নিশ্চয়ই তারা ঘুমন্ত?"

ক্যাপ্টেন বলল, "জেগে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। অবশ্য গুহার ভেতরটা খুব অন্ধকার। রকেট থেকে ফ্ল্যাশ-লাইট আনতে পাঠিয়েছি।"

দু'জন সৈনিক তক্ষুনি দুটি ফ্ল্যাশ-লাইট নিয়ে উপস্থিত হল। জেনারাল লী পো ওভার-কোটের পকেটে হাত দিয়ে নিজেই প্রথমে ঢুকলেন গুহার মধ্যে।

গুহাটা বেশ চওড়া। গোল সুড়ঙ্গের মতন। ভেতরের দিকটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। খানিকটা এগোবার পরই মনে হল মাটিতে পাশাপাশি পঁচিশ-তিরিশ জন লোক শুয়ে আছে তীব্র ফ্ল্যাশ-লাইটের আলো সেখানে পড়া মাত্রই একটা বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল।

জেনারাল অস্ফুট স্বরে বললেন, "এ কী?"

ঝিলম চট্ করে মুখটা ফিরিয়ে নিল। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারেনি।

মাটিতে শুয়ে থাকা প্রত্যেকটি লোকের চোখ খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছে।

জেনারাল লী পো ঝিলমের হাত ধরে টেনে আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "যারা এই কাজ করেছে, তাদের প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হবে। দ্যাখো ঝিলম, এরা শুক্রগ্রহের নয়। এরা পৃথিবীর মানুষ।"

ঝিলম তাকিয়ে দেখল, জেনারাল ঠিকই বলেছেন। কারুরই চুল হলদে রঙের নয়। কালো।

শুধু চোখই খুবলে নেয়নি, প্রত্যেকটি লোকের দু'কানেও ক্ষত, কানগুলো কেটে ফেলা হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধে আছে।

ঝিলম বলল, "ওঃ! এমনভাবে মানুষ খুন করল কেন? এদের খুন করে কার কী লাভ?"

ঝটিকা বাহিনীর ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বলল, "এদের মারতে চাইলে তো শুধু একটা করে বুলেট খরচ করলেই হত। ওরা এত নিষ্ঠুর।"

জেনারাল লী পো বললেন, "আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। চলো, বাইরে চলো।"

ঝিলম হঠাৎ বলে উঠল, "একটু দাঁড়ান, জেনারাল।"

তারপর শুয়ে-থাকা তৃতীয় মানুষটির কাছে গিয়ে পাশে বসে পড়ে সে করুণ গলায় বলল, "চোখ না থাকলেও আমি একে চিনতে পেরেছি। এই যে কপালের ডান দিকে একটা ক্রসের মতন কাটা দাগ। এ আমার বন্ধু ভেলেইন। জেনারাল, আপনি বিখ্যাত অভিযাত্রী ভেলেইনের নাম শোনেননি?"

"কোন ভেলেইন? যে বৃহস্পতির আগুনের বলয়ের মধ্য দিয়ে রকেট চালিয়ে রেকর্ড করেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ইস্। ঐ রকম একটা মানুষের এইরকম জঘন্য মৃত্যু?"

"জেনারাল, আমি ভেলেইনের দেহটা নিয়ে যেতে চাই।"

ঝিলম সেই মৃত লোকটির গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল। এ কী, ওর গা গরম কেন? তাড়াতাড়ি ভেলেইনের বুকে হাত দিয়েই সে উত্তেজিত ভাবে আবার বলল, "জেনারাল, জেনারাল, ভেলেইন এখনো বেঁচে আছে।"

রক্ষী-বাহিনীর সৈনিকেরা সঙ্গে-সঙ্গে অন্য লোকগুলির বুকে হাত রেখে পরীক্ষা শুরু করল। দেখা গেল, মোট সাতাশজন লোকের মধ্যে চব্বিশজনই তখনও বেঁচে আছে। অন্য তিনজনের বুকে কোনো স্পন্দন নেই।

জেনারাল বলল, "আশ্চর্য! এদের মারতে চায়নি। শুধু চোখ আর কান খুবলে নিয়েছে। কিন্তু কেন?"

ঝিলম বলল, "জেনারাল, এখনো এদের চটপট রকেটে তুলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যায়। আর কিছুক্ষণ থাকলে এমনিই মরে যাবে।"

জেনারাল লী পো তক্ষুনি ঝটিকা বাহিনীকে হুকুম দিলেন সব কটি লোককেই বিভিন্ন রকেটে তুলে নিতে।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে ঝিলম বলল, "এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, জেনারাল।"

"কী বলো তো?"

"আমরা যাকে বন্দী করে নিয়ে গেছি, সে একজন ডাক্তার"

"ওঃ হো। তুমি ঠিক ধরেছ তো! লোকগুলোকে ওরা মারতে চায়নি। ডাক্তার এনে ওরা লোকগুলোর চোখ আর কানের পর্দা তুলে নিয়েছে।"

"কত সাবধানে ওরা অপারেশন করেছে, তা ভাবুন! লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের চোখ আর কানের পর্দা তুলে নেওয়া কি সোজা কথা?"

"কিন্তু এই কাজই বা ওরা করল কেন? শুক্রগ্রহে কি চক্ষু-ব্যাঙ্ক আর কানের পর্দার ব্যাঙ্ক নেই?"

"সেটা খোঁজ নিতে হবে।"

"খোঁজ নেবার প্রশ্ন ওঠে না। নিশ্চয়ই আছে। শুক্রগ্রহের লোকদের তুমি এত অসভ্য ভেবো না। তা ছাড়া যেখানে এত ভাল ডাক্তার আছে সেখানে ঐ সব ব্যাঙ্ক থাকবে না?"

"এরা শুক্রগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসা একটি দল। হয়তো এরা আর শুক্রগ্রহে ফিরতেই চায় না। এবার বোঝা যাচ্ছে, রকেট চুরি ওদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের চোখ আর কানের পর্দা চুরি করাই ওদের আসল উদ্দেশ্য। 'রা' আর 'নী' যদি ধরা পড়ত, তা হলে তাদেরও এই অবস্থা হত।"

"কিন্তু হঠাৎ এত চোখ আর কানের পর্দা দরকার হল কেন ওদের? সাতাশ জনের চোখ-কান নিয়েছে, আরও মানুষকে বন্দী করতে চাইছিল।"

"এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। শুক্রগ্রহের এই দলটি কোনো অচেনা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে হঠাৎ কোনো বিস্ফোরণে সেই দলের অনেকের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে আর কানের পর্দা ফেটে গেছে। তাই তারা এই সব চুরি করে নিজের দলের লোকদের চোখ আর কান আবার ঠিক করে দিতে চায়।"

"তোমার অনুমান সত্যি হতে পারে। এ তো আমরা শুধু লালগোলাপের ঘটনা দেখলাম। আর কোনো গ্রহে বা উপগ্রহেও তারা রকেট-অভিযাত্রীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে

টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের চোখ আর কান উপড়ে নিচ্ছে হয়তো। এটা বন্ধ করতেই হবে! নির্বোধ, শয়তানের দল! এরকম ভাবে জ্যান্ত মানুষের চোখ আর কান নষ্ট না করে আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে চাইলে কি আমরা চোখ-কান দিতাম না?"

"হয়তো ওদের এমন কোনো গোপন ব্যাপার আছে, যা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চায় না!"

রাগে, দুঃখে জেনারাল, লী পো'র মুখখানা কুঁকড়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, "ওদের গোপন কথা আমি বার করবই। দেখি ঐ ডাক্তারটা কীভাবে গোপন কথা পেটে চেপে রাখতে পারে। এবার মার লাগাব, বুঝলে, স্রেফ মার! চলো, আর্মস্টং-এ ফিরে চলো।"

দু'জনে গিয়ে উঠে বসল রকেটে।

।।৭।।

নী আর রা ঘুমিয়ে আছে। ইউনুস একা-একা একটু ঘুরতে বেরিয়েছে।

আর্মস্টং নামের এই মহাশূন্যের স্টেশনটাতে পার্ক, থিয়েটার হল, সাঁতার কাটার পুকুর, হাসপাতাল, এই সব কিছুই আছে। মহাকাশ-অভিযাত্রীরা এখানে প্রধানত বিশ্রামের জন্যই আসে। অবশ্য বিরাট একটি গবেষণাগারও আছে। আর ঝটিকা বাহিনীর একটি প্রধান দফতরও বটে।

ইউনুস পার্কে গিয়ে বসল। এই পার্কে কিন্তু একটাও সত্যিকারের গাছ নেই। যদিও দেখলে মনে হবে ছোট-বড় অনেক গাছ ছড়িয়ে আছে, ফুলও ফুটে আছে কয়েকটাতে। এসবই আলো দিয়ে তৈরি। সূর্যমণ্ডলের বাইরে কোথাও এখনও গাছ বাঁচানো যায়নি। বরফ-ঢাকা একটা ছোট গ্রহতে ঝিলম একটা গাছ আবিষ্কার করেছিল। সেটাও মোটেই গাছের মতন দেখতে নয়। খয়েরি রঙের একটা গুঁড়ি, ডাল বা পাতা কিছু নেই, সেই গুঁড়িটার গায়ে ব্যাঙের ছাতার মতন গোল গোল জিনিস লেগে আছে। তাই নিয়েই পৃথিবীর খবরের কাগজগুলোতে কত হৈ চৈ!

ইউনুস ইচ্ছে করেই লোকজনদের এড়িয়ে পার্কে এসে বসল। কারণ সে কারুর কথাই শুনতে পাবে না, কিছু বলতে পারবে না। তার খুব আফশোস হচ্ছে, ঠিক এই সময়েই কেন সে নিঃশব্দ-বড়ি খেল। এখন এত সব কাণ্ড হচ্ছে, অথচ সে যোগ দিতে পারছে না। অবশ্য আর বেশি দিন বাকি নেই। এই জায়গাটার আবহাওয়া পৃথিবীর মতনই বলে এখানে বলে বয়েস বাড়ে না। কিন্তু একবার মহাশূন্যে রকেট নিয়ে বেরুলেই হু-হু করে দিন কেটে যায়।

ইউনুস একটা বেঞ্চিতে বসেছে, পাশেই একটা আলোর ফুলগাছের ঝোপ, তাতে যেন সত্যিকারের গাঁদা ফুল ফুটে আছে। একটু দূরে একটা ফোয়ারা, সেটাও জলের নয়, আলোর। মহাশূন্যে বেশি দিন থাকলে সত্যিকারের গাছ আর ফুল দেখার জন্য খুব মন কেমন করে।

একটি আফ্রিকান মেয়ে এসে বসল ইউনুসের পাশে।

ইউনুস মনে মনে ভাবল, এই রে। এই কালো কুচকুচে মেয়েগুলোর খুব রূপের গর্ব হয়। আর এদের বুদ্ধিও খুব সাংঘাতিক। এর সঙ্গে কথা না বললেই তো চটে যাবে।

ইউনুস ইশারা করে নিজের মুখ আর কান দেখিয়ে দিল।

মেয়েটি অবাক ভাবে চেয়ে বলল, "জীবন খুব সুন্দর, নই না?"

ইউনুস আন্দাজেই কথাটা বুঝে ঘাড় হেলিয়ে বোঝাল যে, হ্যাঁ।

মেয়েটি আবার বলল, "আপনারা কোন্ রকেটে এসেছেন?"

ইউনুস আবার মুখ আর কানে হাত দিয়ে বোঝাল।

মেয়েটি তবু জিজ্ঞেস করল, "লালগোলাপ-উপগ্রহটি সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?"

ইউনুস ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করল।

মেয়েটি এবার বলল, "আপনাকে দেখতে খুব বিচ্ছিরি!"

ইউনুস কিছুই বুঝতে না পেরে মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

"সত্যি কথা বলতে কী, আপনাকে অবিকল একটা সাদা শুয়োরের মতন দেখতে!"

ইউনুস মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে।

মেয়েটি হেসে উঠে বলল, "সত্যিই তা হলে বোবা আর কালা? যাক্, তা হলে আর কোনো চিন্তা নেই।"

ইউনুস কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দারুণ চমকে উঠেছে। কারণ সে মেয়েটির মনের কথা বুঝতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটি ভাবছে, শুক্রগ্রহের 'এস' নামে লোকটি এখানে এসে পড়বে এক্ষুনি কেউ তাকে চিনতে না পারে কেউ যেন বুঝতে না পারে, কেউ টের না পায়। এই বোবা কালা লোকটিকে এখান থেকে সরানো দরকার।

মেয়েটি নানান অঙ্গ-ভঙ্গি করে ইউনুসকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, তার একজন বন্ধু এখানে আসবে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে বসুক।

ইউনুস কিছুই বুঝতে না পারার ভান করে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে মেয়েটির মনের কথা আরও পড়তে পারছে। এই মেয়েটিও একজন ডাক্তার। শুক্রগ্রহের লোকটিকে যেখানে পরীক্ষা করা হচ্ছিল, সেখানে এই মেয়ে-ডাক্তারটি ডিউটিতে ছিল। শুক্রগ্রহের লোকটি কোনোক্রমে একে হাত করেছে। তাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারলে মেয়েটিকে সে অনেক কিছু দেবে বলেছে।

কী দেবে? সোনা। এই মেয়েটির দেহের ওজনের সমান সোনা। আফ্রিকার মেয়েরা এত বোকা হয়? সোনা নিয়ে ও কী করবে? ঠাকুমা-দিদিমার যুগের মেয়েরা সোনার গয়না পরত, এখন কেউ পরে না। তাছাড়া তো সোনার আর বিশেষ কোনো দাম নেই। ও হ্যাঁ, শুক্রগ্রহে সোনার এখনো খুব দাম আছে। এই মেয়েটি কি শুক্রগ্রহে চলে যেতে চায়? হ্যাঁ, বোঝাই যাচ্ছে ওর মনে-মনে তাই ইচ্ছে।

মেয়েটি চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক চাইছে। একটু বাদে সে বেঞ্চ ছেড়ে গিয়ে ফোয়ারাটার কাছে দাঁড়াল। তখন দেখা গেল হাসপাতালের দিক থেকে হেঁটে আসছে একজন মানুষ। এখানকার ডাক্তারদের মতন সাদা পোশাক পরা, মাথায় একটা টুপি। সেই টুপিতে কপালের অনেকখানি ঢেকে আছে।

লোকটি এসে দাঁড়াল কালো মেয়েটির সামনে। তারপর ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

ইউনুস বুঝতে পারল, এই সেই শুক্রগ্রহের 'এস্'। মাথার হলদে চুল ঢেকে নিয়েছে টুপিতে, এখানকার কোনো ডাক্তারের ছদ্মবেশ ধরেছে। কোনো ডাক্তারকে আজমকা মেরে তার পোশাকটা খুলে নেওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়। লোকটির গায়ে অসম্ভব জোর।

ইউনুস তক্ষুনি লোকটিকে ধরবার চেষ্টা করল না। ঐ লোকটার কাছে কিংবা মেয়েটার কাছে কোনো অস্ত্র থাকা স্বাভাবিক। ইউনুসের কাছে কিছুই নেই। সে বেঞ্চে বসেই ওদের দিকে নজর রাখতে লাগল।

লোকটি একবার দেখল ইউনুসকে। মেয়েটি আবার তাকে কী যেন বলল, ইউনুসকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে লোকটি, তাই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করল উল্টো দিকে। মেয়েটিও চলল তার সঙ্গে।

ইউনুস কী করবে প্রথমে ঠিক করতে পারল না। সে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতে পারবে না। কারুকে যে কিছু ডেকে বলবে তার উপায় নেই। অথচ ওদের চোখের আড়ালেও যেতে দেওয়া যায় না। ইউনুস উঠে পড়ে যেতে লাগল ওদের পিছু পিছু।

পার্কের রেলিংয়ের কাছে গিয়ে লোকটি ফিরে দাঁড়াল। ইউনুস মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল, খুব সম্ভবত লোকটির কাছে কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু মেয়েটির কাছে থাকা খুবই সম্ভব। সেই জন্য সে শুক্রগ্রহের লোকটিকে কিছু না বলে, তীরের মতন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। সেই কালো মেয়েটি তার হাতের ব্যাগ খোলার সময়ই পেল না।

শুক্রগ্রহের লোকটি টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল ইউনুসকে। কিন্তু ইউনুস প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরে আছে মেয়েটিকে। শুক্রগ্রহের লোকটি এবার দারুণ জোরে দুটি ঘুঁষি মারল ইউনুসের চোয়ালে। তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, তবু ইউনুস ছাড়ল না। লোকটি ইউনুসকে মেরেই চলল।

পার্কের পাশেই রাস্তা। কিছু লোক থমকে গেল এই দৃশ্য দেখে। একটা লোক একটা মেয়েকে চেপে ধরে আছে, আর একটা লোক তাকে মারছে, এই দৃশ্য দেখে লোকে তো অবাক হবেই। ঝটিকা বাহিনীর দু-জন সৈনিকও চলে এল সেখানে।

মেয়েটি এবার কেঁদে কেঁদে বলল, "দেখুন, আমি পার্কে আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ এই লোকটা আমায় আক্রমণ করেছে।"

শুক্রগ্রহের ছদ্মবেশী লোকটি বলল, "এই লোকটি হয় কোনো পাগল অথবা গুণ্ডা!"

ঝটিকা বাহিনীর একজন সৈনিক ইউনুসের দিকে এল এম জি উঁচিয়ে বলল, "কী ব্যাপার? এক্ষুনি মেয়েটিকে ছেড়ে দাও!"

ইউনুস মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল।

সৈনিকটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোন রকেটে এসেছ?"

সে-কথার উত্তর দেবার উপায় নেই ইউনুসের। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এমন ভান করল যেন দৌড়ে পালাবে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে শুক্রগ্রহের লোকটির মাথা থেকে টুপিটা ছিনিয়ে নিল। অমনি বেরিয়ে পড়ল তার হলদে চুল।

সৈনিক দু-জন অবাকভাবে তাকিয়ে রইল লোকটির চুলের দিকে। সেই সুযোগে লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল ওদের একজনের হাতের এল এম জি। তারপর সেটা দিয়েই খুব জোরে মারল অন্য সৈনিকটির মাথায়। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

শুক্রগ্রহের লোকটি এবার কড়া গলায় বলল, "যে আমার সামনে আসবে, তাকে ঝাঁঝরা করে দেব।"

সবাই ভয় পেয়ে দূরে সরে দাঁড়াল। এমন কান্ড এই আর্মষ্ট্রং ষ্টেশনে আগে কখনো হয়নি।

লোকটি এল এম জি উঁচিয়ে রেখে বলল, "এবার চলো রকেট ষ্টেশনে!"

ঝটিকা বাহিনীর যে সৈনিকটির হাত থেকে এল এম জি-টা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে এবার হেসে উঠল হা-হা করে। তারপর বলল, "এখান থেকে পালানো অত সহজ! চালাও দেখি গুলি!

ইউনুসও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে শুক্রগ্রহের লোকটিকে অগ্রাহ্য করে আবার মেয়েটির কাছে এসে চেপে ধরল তার হাতব্যাগটা।

লোকটি হিংস্র গলায় বলল, "তবে তুমি মরো!"

এল এম জি-টা তুলে সে ট্রিগার টিপল। গুলি বেরুবার বদলে তার থেকে বেরুলো খানিকটা ধোঁয়া। ইউনুস আর কালো মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

এখানে মানুষ মারার কোনো অস্ত্রই ব্যবহার করা হয় না। এই এল এম জি-গুলো আগেকার দিনের মতন দেখতে হলেও এর মধ্যে গুলি থাকে না। এতে ভরা থাকে ঘুম-পাড়ানি ধোঁয়া।

ততক্ষণে অজ্ঞান সৈনিকটির এল এম জি-টা অন্য সৈনিকটি তুলে নিয়েছে। শুক্রগ্রহের লোকটি তার দিকে ফিরতেই দু-জনেই একসঙ্গে ট্রিগার টিপল দু-জনেই একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। রাস্তার লোকেরা এবার হাসতে লাগল সবাই। অদ্ভুত যুদ্ধ! কেউ মরেনি, পাঁচ জন অজ্ঞান।

হাসপাতালের কর্মীরা এসে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল পাঁচ জনকেই। তখন জানা গেল, এর আগে হাসপাতালে একজন ডাক্তার আর একজন নার্সকে গলা টিপে অজ্ঞান করে, তাদের হাত-পা বেঁধে রেখে পালিয়ে এসেছে শুক্রগ্রহের লোকটি।

জেনারাল লী পো এই ঘটনার কথা শুনে দারুণ রেগে গেলেন। পুরো একদিন ওরা অজ্ঞান হয়ে থাকবে, এর মধ্যে আর শুক্রগ্রহের লোকটিকে জেরা করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে এ লোকটি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, মানুষ খুন করতে ওর একটুও দ্বিধা নেই। ইউনুসকে মেরে ফেলার জন্যই তো ও ট্রিগার টিপেছিল।

জেনারাল লী পো হুকুম দিলেন, "জ্ঞান ফেরার পর ঐ লোকটিকে এক ঘন্টা জেরা করা হবে, তাতেও ও যদি ওদের আস্তানার কথা না জানায়, তা হলে অপারেশন

করা হবে ওর মস্তিষ্কে। এমন সাংঘাতিক লোককে আর বিশ্বাস করা যায় না। মস্তিষ্কের একটা অংশ অপারেশন করে বদলে দিলেই ও ভাল হয়ে যাবে। তখন মানুষ খুন তো দূরের কথা, একটা সামান্য পোকা-মাকড় মারতেও ওর কষ্ট হবে।

ইউনুস রইল হাসপাতালে, ঝিলম ফিরে এল হোটেলে। নী আর রা জেগে উঠেছে এর মধ্যে নিচের তলার রেস্তোরাঁয় গিয়ে ওরা তিনজনে মিলে অনেকদিন পর পৃথিবীর খাবার খেল পেট ভরে। দেরাদুনের চালের সুগন্ধ ভাত, ঘি, মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পালং শাক, চিংড়ি মাছের মালাইকারী, শর্ষে-বাটা দিয়ে ইলিশ আর ভাপা দই।

নী বলল, "ট্যাবলেট আর শুকনো স্যাণ্ডউইচ খেতে-খেতে মুখ একেবারে পচে গিয়েছিল।"

রা বলল, "ইস, ইউনুসটা নেই, ও এসব খেতে পেল না!"

খাওয়ার পর ওরা গেল একটা সিনেমা দেখতে। ঝিলম খুব গম্ভীর, তার মুখে চিন্তার ছাপ। সে সিনেমায় মন দিতে পারছে না।

সিনেমা ভাঙার পর রা বলল, "চলো, এখন বাষ্প- স্নানঘরে যাওয়া যাক। অনেক দিন স্নান করিনি।"

নী বলল, "হ্যাঁ, তাই চলো রা-দি! তুমি বলেছিলে এখানকার বাষ্পঘর চাঁপাফুলের গন্ধে ভরা থাকে?"

রা বলল, "হ্যাঁ রে, ভারী সুন্দর।"

ঝিলম বলল, " তোমরা যাও, আমার কাজ আছে। একবার জেনারাল লী পো-র সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

ঠিক হল বাষ্প-স্নান সেরে নী আর রা ফিরে যাবে হোটেলে। ঝিলমও সেখানে এক ঘন্টা বাদে ফিরবে।

জেনারাল লী পো-র কাছে গিয়ে ঝিলম আর একটা দুঃসংবাদ শুনল। এলোইস নামের একটি নক্ষত্রে আরও কুড়ি জন মানুষকে পাওয়া গেছে, তাদেরও চোখ আর কানের পর্দা নেই। ঝটিকা বাহিনীর একটা অনুসন্ধান দল এক-এক করে গ্রহ-নক্ষত্র খুঁজে খুঁজে দেখছে। এ রকম আরও কোথাও আরও কত মানুষ পড়ে আছে কে জানে!

চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে জেনারাল লী পো বললেন, "খুনে, গুণ্ডার দল।। সমস্ত মহাকাশ জুড়ে ওরা চোখ আর কান ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। জীবন্ত মানুষের চোখ তুলে নেবে, কান ছিঁড়ে নেবে, এ কি কল্পনা করা যায়?"

ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "জানিয়েছি তো বটেই! তাঁরা কোনো দায়িত্ব নিতে চান না। তাঁর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, শুক্রগ্রহ থেকে একটা দল সূর্যমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে গেছে, সেই দলটার ওপর শুক্রগ্রহ সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই!"

ঝিলম থাকতে থাকতেই আরও দুটো খবর এল।

আবার আর একটা গ্রহে পাওয়া গেছে ঐ রকম চোখ-কান খোবলানো বারোজন মানুষ। সেখানেও চারটি রকেট পড়ে আছে এমনি এমনি। এই ডাকাতরা আর কিছু নেয় না। নেয় শুধু চোখ আর কানের পর্দা।

আর একটা খবর হচ্ছে, শুক্রগ্রহের লোকদের একটি রকেট মহাশূন্যে ঝটিকা বাহিনীর একটি রকেট দেখেই আক্রমণ করে। সেখানে একটুক্ষণের মধ্যেই আরও দুটি ঝটিকা বাহিনীর রকেট এসে পড়েছিল হঠাৎ। তখন শুক্রগ্রহের লোকদের রকেটটি পালাবার চেষ্টা করলেও সেটিকে ঘায়েল করা হয়েছে শেষ পর্যন্ত। শুক্রগ্রহের দু-জন লোককে বন্দী করা হয়েছে। তাদের নিয়ে এখানে এসে পৌঁছতে দু-দিন সময় লাগবে।

ঝিলম হঠাৎ বলল, " জেনারাল, আমি একটা অনুরোধ জানাব।"

"কী, বলো?"

" আমি রকেট নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তে চাই। আমাদের সবচেয়ে আগে দরকার, শুক্রগ্রহের এই দলটির মূল ঘাঁটিটা খুঁজে বার করা। ঝটিকা বাহিনী যেমন অনুসন্ধান চালাচ্ছে চালাক। আমি নিজেও একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"তুমি একলা কী করবে? এখন তো দেখা যাচ্ছে এদিকে আকাশ পথে চলাচল করাই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কখন ওরা কাকে আক্রমণ করবে ঠিক নেই।"

"ওরা আমাদের ধরতে পারবে না। দেখলেন তো একবার নী আর রা-কে ধরবার চেষ্টা করেও পারেনি।"

"তুমি যদি দুঃসাহস দেখাতে চাও, তাহলে আর আমার কী বলবার আছে? তুমি রকেট নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইলে তো আমার অনুমতির দরকার নেই?"

"আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। তাছাড়াও আমার একটি প্রার্থনা আছে। শুক্রগ্রহের যে লোকটিকে আমরা বন্দী করে এনেছি তাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।"

"সে কী!"

"ওর কাছ থেকেই খবর বার করবার চেষ্টা করব।"

"আমরা এত চেষ্টা করেও পারিনি—"

"ওকে আমি হো-সানের কাছে নিয়ে যাব। তিনি নিশ্চয়ই ওর মনের কথা বুঝতে পারবেন।"

"হো-সান! তিনি মনের কথা পড়তে পারেন, এমন তো কখনো শুনিনি। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন।"

"তিনি সব পারেন। তাঁর ওপরে আমার অগাধ শ্রদ্ধা।"

"ঠিক আছে। তা হলে নিয়ে যাও ওকে। আর দু-জনকে তো বন্দী করে আনছেই। তবে দেখো, খুব সাবধান! ঐ লোকটি সাপের থেকেও বেশি বিষাক্ত!"

সব ব্যবস্থা করার জন্য ঝিলম তখুনি উঠে পড়ল।

ঝিলম ভেবেছিল, নী আর রা-কে এখানেই রেখে যাবে। কিন্তু ওরা কিছুতেই রাজি নয়। এমন রোমাঞ্চকর অভিযানের সুযোগ ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। ঝিলম একটু বোঝাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। রা-কে বিপদের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।

তাহলে ইউনুসকেই বা ফেলে যাওয়া যায় কী করে? ইউনুসের ঘুম ভাঙবে কাল সকালে। শুক্রগ্রহের লোকটিও জাগবে সেই সময়। তাহলে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়।

রাত্তিরটা ওরা আরাম করে ঘুমিয়ে নিল নরম বিছানায়।

।।৮।।

এই প্রথম ওরা রকেটে সবাই একসঙ্গে জেগে আছে। শুক্রগ্রহের লোকটির অবশ্য হাত আর পা বেঁধে রাখা হয়েছে। কনট্রোলে বসেছে ঝিলম। ইউনুস বসে আছে শুক্রগ্রহের লোকটির মুখোমুখি। ঝিলম তাকে লিখে জানিয়েছে, সে যেন চেষ্টা চালিয়ে যায় যতদূর সম্ভব ঐ লোকটির মনের কথা জানবার।

ঝিলম প্রথমেই চলেছে হো-সানের কাছে।

হো-সান কখন কোথায় থাকেন তার কোনো ঠিক নেই। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ভোরে উঠেই ঝিলম অনেকগুলো জায়গায় খবর নিয়ে জেনেছে যে, এখন হো-সান খুব কাছেই আছেন।

নী জিজ্ঞেস করল, "রা-দি, এই হো-সান কে?"

রা বলল, "তিনি এমনিতে একজন বৈজ্ঞানিক, আসলে তিনি একজন মহাপুরুষ। আমি ওঁর মতন মানুষ আর একজনও দেখিনি। ওঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।"

নী বলল, "বৈজ্ঞানিক? যিনি প্রথম এনার্জিকে ম্যাটারে পরিণত করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি এখনো বেঁচে আছেন? সে তো কবেকার কথা। ঐ জিনিসটা তো আবিষ্কার হয়েছিল দু-হাজার দশ সালে। আমরা ইস্কুলের বইতে পড়েছি, ঢাকার সায়েন্স-কংগ্রেসে একজন বৈজ্ঞানিক একটা কাচের বাক্সের মধ্যে ঢুকে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালালেন। ফস করে আগুন জ্বলে উঠে বারুদটা পুড়ে গেল। তারপর তিনি যখন কাচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন, সবাই দেখল কাঠিটা আগের মতনই আছে। আবার সেটা জ্বালানো যায়। সবাই ভাবল, ওটা বুঝি ম্যাজিক। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক বোঝালেন যে, বারুদ থেকে যদি আগুন হয়, তাহলে সেই আগুন থেকে আবার বারুদ হবে না কেন? সেই তিনিই তো?"

"হ্যাঁ। উনি আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এমন-কী সেদিন লালগোলাপে নেমে যে ট্যাবলেট খেলাম, যার জন্য কেউ আমাদের ছুঁতে পারল না, সেই ট্যাবলেটও ওঁর আবিষ্কার। ওঁর এখন কত বয়েস তা কেউ জানে না। তুই এসপারান্টো ভাষায় হো-সান মানে জানিস তো?"

"নিঃসঙ্গ।"

"উনি এখন সত্যিই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসীম মহাশূন্যে ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছেন। একদম একলা থাকেন।"

ঝিলম মুখ ফিরিয়ে বলল, "রা, আমাদের বিয়ের খবর পেয়ে উনি যে একটা উপহার পাঠিয়েছিলেন, তা বললে না?"

নী বলল, "কী উপহার, রা-দি?"

রা বলল, "একটা ছোট্ট কালো রঙের চকচকে পাথর, তাতে দারুণ সুন্দর গন্ধ। পাথরের যে এমন চমৎকার গন্ধ থাকতে পারে, তা আগে আমার ধারণাই ছিল না। সব সময় কাছে রাখলে গন্ধটা পুরনো হয়ে যাবে বলে সেটা আমি সঙ্গে রাখিনি। আমার বাবা ওঁর লেবরেটরিতে কাজ করতেন এক সময়, সেই জন্য উনি আমায় খুব স্নেহ করেন।"

নী জিজ্ঞেস করল, "উনি যে একদম একা থাকেন, ওঁর কষ্ট হয় না?" রা বলল, "উনি বলেন, বিজ্ঞানের চর্চাই ওঁর তপস্যা। শেষ বয়েসে উনি একা-একাই ঐ তপস্যা করতে চান। উনি তো এখনো একটা দারুণ অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন।"

"অস্ত্র?"

শুক্র গ্রহের লোকটিও এইসব কথা শুনছিল। ঝিলম তার দিকে ইঙ্গিত করে রা-কে বলল, "ওকথা থাক, রা।"

রা একটু চুপ করে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আমারও বিশ্বাস, হো-সান এই লোকটিকে দেখলেই এর মনের কথা বলে দিতে পারবেন।"

নী বলল, "আচ্ছা রা-দি, আমি সেদিন যখন নীল মেঘটায় নেমে স্নান করছিলাম, তখন আলো-রশ্মি দিয়ে কারা আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? এরাই?"

রা বলল, 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে। শুক্রগ্রহের এই মানুষগুলো ছাড়া মহাশূন্যে আর কারা চুরি-ডাকাতি করবে?"

ঝিলম বলল, "আমার মনে হয়, ঐ চুম্বক-আলো দিয়েই ওরা অনেক রকেটও নামিয়েছে. আমাদের এই সাত-দুই-নয়- শূন্য রকেটটাকে অবশ্য ঐভাবে নামানো খুবই শক্ত ব্যাপার। তবে অন্য দু-একটি দেশের কমজোরি রকেটগুলো টানতে পারে।"

নী ককপিটের সামনের কাচের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইশ, এখন আর একটাও মেঘ দেখা যাচ্ছে না।"

রা বলল, "মেঘ থাকলেও তোমাকে আর নামতে দেওয়া হত না।"

ইউনুস একেবারে স্থিরভাবে শুক্রগ্রহের লোকটির দিকে চেয়ে বসে আছে। সে বেচারির তো এদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দেবার উপায় নেই।

হো-সান যেখানে থাকেন, সেই জিনিসটার নাম 'শান্তি'। সেটা উপগ্রহ কিংবা নক্ষত্র কিংবা রকেটও নয়। সেটা সাবানের ফেনার বুদ্বুদের মতন একটা গোল, স্বচ্ছ জিনিস। সেটাকে চালাতে হয় না, সেটা আপনি-আপনি ভেসে বেড়ায়। বৃদ্ধ হো-সান এই বুদ্বুদটার মধ্যে ইচ্ছে করে নির্বাসন নিয়েছেন

দূর থেকে ছোট্ট একটা বুদ্বুদের মতন দেখলেও সেটা অবশ্য সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিতে ভরা। সবই হো-সানের নিজের হাতে তৈরি। কোনো রকেট ইচ্ছে করলেও এটাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে পারবে না। কারণ এর চারপাশ ঘিরে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বইছে। হো-সান নিজে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না চাইলেও সমস্ত স্পেস-স্টেশন ঐ শান্তি নামের বুদ্বুদটির খোঁজ-খবর রাখে। মাঝে মাঝে বিশেষ-বিশেষ কেউ দেখা করতে যায় ওঁর সঙ্গে।

শান্তির কাছাকাছি এসে ঝিলম সিগন্যাল দিতে লাগল।

কমপিউটার জিউস বলল, "মেশিন বন্ধ করে দাও, ঝিলম। হো-সান একেবারে শব্দ সহ্য করতে পারেন না, মনে নেই? শান্তির দরজা খুললেই আমাদের রকেটের প্রচণ্ড শব্দ ভেতরে ঢুকবে।"

ঝিলম বলল, "ধন্যবাদ, জিউস। আমরা শান্তি থেকে কতটা দূরে আছি?"

"মাত্র সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার।"

"এবার আমরা ওর নিচের দিকে যাব তো?"

"হ্যাঁ। গতিপথ ঠিক করে দিয়েছি আমি, তুমি মেশিন বন্ধ করে দিলেই ঠিক চলে যাব---"

শান্তির ভেতর অনেকখানি জায়গা থাকলেও রকেটসুদ্ধু তার মধ্যে ঢোকা যায় না। রকেটটা ওর নিচে নিয়ে গেলেই একটা দরজা খুলে যায়, তখন রকেট থেকে বেরুলেই ওপরে টেনে নেয়। মনে হয় যেন একটা ঝড় এসে ঠেলে নিয়ে যায় ভেতরে।

ঝিলম বলল, "জিউস, তোমার ওপর রকেটের ভার দিয়ে গেলাম।"

জিউস বলল, "ঠিক আছে। মহাত্মা হো-সানের কাছ থেকে আমার জন্য আশীর্বাদ চেয়ে এনো।"

"নিশ্চয়ই।"

এর পর ঝিলম চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল ইউনুসকে। ইউনুস আর ঝিলম দু'দিক থেকে ধরল বন্দীটিকে। সে বিশেষ বাধা দেবার চেষ্টা করল না। হো-সানকে দেখবার জন্য তারও কৌতূহল হয়েছে বোধহয়।

ওরা রকেটের ওপর এসে দাঁড়াতেই বুদ্বুদের মতন গোলকটির খানিকটা অংশ খুলে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা হুশ করে ঢুকে গেল ভেতরে। সেই অংশটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে ওরা খানিকটা হাওয়ার মধ্যে ভাসতে-ভাসতে তারপর আস্তে-আস্তে নেমে পড়ল নিচে।

ঠিক যেন সবুজ ঘাস আর গাছপালা ভরা একটি মাঠ আর তার মাঝখান দিয়ে একটা সুরকি-বিছানো পথ। আসলে অবশ্য সবই আলোর কারসাজি। সুরকির বদলে ঐ রঙের কাগজকুচি ছড়ানো আছে পথটায়। সেই পথের শেষে একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি।

ওরা একটুখানি এগুতেই সেই বাড়িটির দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। ছোট খাটো চেহারা সাদা পাজামার ওপরে একটা সাদা ফতুয়া, পায়ে চটি সেই বৃদ্ধের যে কত বয়েস তা বোঝবার উপায় নেই। তার মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখে পাতলা-পাতলা দাড়ি সাদা, গোঁফ সাদা, ভুরু সাদা, এমন কী চোখের পল্লব আর গায়ের লোমও সব সাদা। তিনি সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পা টেনে-টেনে হাঁটেন। ইনিই মহাকাশের নিঃসঙ্গ মানুষ হো-সান।

বন্দীর হাত ছেড়ে দিয়ে ঝিলম আর ইউনুস এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করল তাঁকে। নী আর রা প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

ঝিলম বলল, "হে গুরুদেব, আপনার জীবন আনন্দময় নিশ্চয়ই?"

হো-সান বললেন, "আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, তবু জীবন বড় সুন্দর, বড় মধুময়। তোমাদের জীবন আরও বিচিত্র, আরও সুন্দর হোক।"

রা-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেমন আছ, রাভী মামণি? তোমাকে সেই কত ছোট্ট দেখেছিলাম। এই মেয়েটি কে?"

রা বলল, "এর নাম নীলাঞ্জনা। আমার আত্মীয় হয়।"

"বাঃ বেশ নামটি তো।"

ঝিলম বলল, "আমার বন্ধু ইউনুসকে চিনতে পারছেন তো? একবার মাত্র দেখেছেন আগে।"

"হ্যাঁ, চিনেছি। ও বুঝি নিঃশব্দ-বড়ি খেয়েছে? এসো, তোমরা সবাই ভেতরে এসো। এই শুক্রগ্রহের লোকটিকে পেলে কোথায়?"

ঝিলম বলল, "সে অনেক ব্যাপার আছে। এই জন্যেই আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে এসেছি।"

দরজা দিয়ে ঢুকেই ভেতরে একটি বসবার ঘর। সোফা কৌচ দিয়ে সাজানো, এক পাশে একটা টি ভি, দেয়ালে নানা রকম ফুলের বাঁধানো ছবি। ঠিক যেন পৃথিবীর যে কোনো শহরের একটা বাড়ি! এখানে ঢুকলে বোঝাই যায় না যে, ওরা এখন অসীম মহাশূন্যের একটা ভাসমান বুদ্বুদের মধ্যে রয়েছে।

শুক্রগ্রহের বন্দীটিকে ইউনুস আর ঝিলম বসিয়ে দিল একটি সোফায়।

এবার সে কথা বলে উঠল। সে হো-সানের দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে বলল, "আপনি হো-সান। আপনার নাম আমরাও শুনেছি। এরা আমায় ধরে এনেছে, আপনি নাকি আমার মনের সব কথা বার করে দেবেন। দেখি, কেমন আপনার শক্তি!"

হো-সান দু-দিকে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "না, না, আমার সে-রকম কোনো শক্তি নেই! এরা বাড়িয়ে বলে। একেবারে তিনকেলে বুড়ো হয়ে গেছি, চোখেও ভাল দেখতে পাই না। আমি কি আর ওসব পারি? আগে একটু-আধটু পারতাম।"

তারপর তিনি নী-র দিকে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, "নীলাঞ্জনা, তুমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারো? একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি, বলো তো? কালোর মধ্যে আলো, কালো নিভলেও কালো। কী?"

নী প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "চোখ! চোখের মণি কালো, তাই দিয়ে সব আলো দেখা যায়। আবার চোখ বুঁজলেই সব কিছু কালো হয়ে যায়।"

হো-সান বললেন, "বাপ রে এই মেয়ের কী বুদ্ধি। একটু চিন্তাও করতে হল না।"

নী বলল, "অবশ্য অনেকের চোখের মণি নীল কিংবা খয়েরিও হয়।"

হো-সান বললেন, "তোমার চোখ কালো, রাত্রীর চোখ কালো, ঝিলম আর ইউনুসের চোখও তো কালোই দেখছি। আচ্ছা, আর একটা বলো তো? আকাশ থেকে আশমেটাও, যেথায় ইচ্ছে যাও, একটা ছেড়ে আরেকটায়, তিনের অর্ধেক নাও।"

এবার নী-কে একটু ভাবতে হল। মন দিয়ে কিছু চিন্তা করার সময় নী একটু ট্যারা হয়ে যায়। তবু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে বলে উঠল, "ও, বুঝেছি! কান! আকাশ থেকে আশমেটাও, অর্থাৎ আশ বাদ দিলে থাকে কা, আর তিনের অর্ধেক করলে হয় তি আর ন, এর মধ্যে একটা ছেড়ে আরেকটায় অর্থাৎ ন!"

হো-সান বললেন, "এটাও ধরতে পেরেছ? বাঃ!"

ঝিলম আর রা অবাক হয়ে চোখাচোখি করল একবার।

হো-সান এবার বললেন, "রাত্রী আর নীলাঞ্জনা, তোমরা একটু বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে দ্যাখো জায়গাটা। আমি ঝিলমের সঙ্গে কথা বলি।"

মেয়ে দুটি বেরিয়ে যাবার পর ঝিলম শুক্রগ্রহের লোকদের ডাকাতির ঘটনাটা সংক্ষেপে শোনাল হো-সানকে।

সব শুনে তিনি খুব দুঃখিতভাবে শুক্রগ্রহের বন্দীটিকে বললেন, "ছিঃ আপনারা এ রকম করছেন কেন? আপনি ডাক্তার, আপনার কাজ হচ্ছে মানুষের প্রাণ বাঁচানো। সব মানুষের প্রাণের দাম সমান। আপনি একজন মানুষের চোখ আর কান তুলে নিয়ে অন্য একজনকে সুস্থ করে তুলেছেন? আপনার বিবেকে লাগছে না?"

শুক্রগ্রহের বন্দীটি অবহেলার সঙ্গে বলল, "সব মানুষের প্রাণের দাম মোটেই সমান নয়! মানুষের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি, শক্তি বেশি, তাদেরই বেঁচে থাকবার অধিকার বেশি।"

হো-সান বললেন, "এ তো আপনি বলছেন জন্তু জানোয়ারদের কথা। মানুষই তো দুর্বলের সেবা করে, অন্যদের স্নেহ করে, ভালবাসে। একটি অসুস্থ শিশুকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য আমরা ব্যস্ত হই কেন? সেই শিশুটির তুলনায় তো আমাদের বুদ্ধিও বেশি, গায়ের জোরও বেশি! যাই হোক শুনুন! আপনারা শুক্রগ্রহ ছেড়ে অজানার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু মন থেকে অকারণ হিংসা আর লোভ মুছে ফেলুন! আপনাদের দলের কিছু লোকের যদি চোখ অন্ধ আর কানের পর্দা ফেটে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের সবাইকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা সানন্দে তাদের চোখ আর কান ঠিক আগের মতন করে দেব।"

বন্দীটি বলল, "আমরা আপনাদের কোনো সাহায্য চাই না!"

"সাহায্য না চেয়ে, এরকম মহাকাশে ডাকাতি করবেন ভেবেছেন?"

ঝিলম বলল, "বোঝাই যাচ্ছে, ওরা কোনো একটা অজানা গ্রহে কিংবা নক্ষত্রে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছে, যার কথা আমাদের জানাতে চায় না কিছুতেই।"

হো-সান হেসে বললেন, "ক'দিন গোপন রাখবে? বেশিদিন গোপন রাখা কি সম্ভব? তোমার মতন কত অভিযাত্রী মহাকাশ ঘুরছে, তাদের কেউ-না-কেউ একদিন-না-একদিন খুঁজে পাবেই!"

ঝিলম বলল, "সেই কথাটাই তো এরা বুঝছে না।"

ইউনুস বন্দীটির দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে।

ঝিলম হো-সানকে বলল, "এই লোকটি এখানে থাক, ইউনুস পাহারা দেবে। গুরুদেব, আমি আপনার লেবরেটরিটা একবার দেখতে চাই।"

বাড়িটার পিছন দিকে বিরাট লেবরেটরি। হো-সান ছাড়া আর একজনও লোক নেই, এটা ভাবলেই কেমন যেন গা ছমছম করে। একেবারে সম্পূর্ণ একা কোনো মানুষ থাকতে পারে? বৃদ্ধ হো-সান যদি হঠাৎ এখানে কোনোদিন মরেও যান, কেউ টেরও পাবেনা।

লেবরেটরিতে এসে ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব, সেই অস্ত্রটার কতদূর কী হল?"

হো-সান বললেন, "দিন ফুরিয়ে এসেছে আমার। বোধহয় আর শেষ করে যেতে পারব না। অনেকখানি এগিয়েছিলাম, কিন্তু আরও অনেক পরীক্ষা করতে হবে। কাজে লাগিয়ে দেখতে হবে।"

ঝিলম উত্তেজিতভাবে বলল, "অনেকখানি এগিয়েছেন? তাহলে আমার ওপরে পরীক্ষা করুন!"

"তোমার ওপরে, তা কি হয়? এখনো অনেক বিপদের ঝুঁকি আছে!"

"আপনি জানেন, কোনো বিপদকে আমি ভয় করি না। যদি আপনার পরীক্ষার কাজে লাগতে পারি—"

"আমি ভয় করি, ঝিলম, আমি ভয় পাই। একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে কি পরীক্ষা করা যায়।"

হো-সান তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত নিয়েছেন। তিনি যেটা আবিষ্কার করতে চলেছেন, সেটা আসলে কোনো অস্ত্র নয়, একটা শক্তি। এতকাল ধরে মানুষ শুধু মানুষ মারার জন্য কত রকম অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। হো-সান আবিষ্কার করতে চান এমন এক প্রতিরোধ-শক্তি, যে-শক্তি পেলে কোনো অস্ত্রই সেই মানুষকে ধ্বংস করতে পারবে না।

এরপর হো-সানের সঙ্গে ঝিলমের কিছুক্ষণ ধরে অনেক গোপন কথাবার্তা হল। তারপর হো-সান রা আর নী-কে ডেকে আনলেন সেখানে। রা-র কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, "রাণী মামণি, আমি একটা প্রতিরোধ-শকিত আবিষ্কার করেছি, যেটা এখনো পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়নি। এখনো বিপদের ঝুঁকি আছে। ঝিলম সেটা ব্যবহার করতে চাইছে। ওকে দেওয়া কি ঠিক হবে? ঝিলরম যে আমার খুব স্নেহের, বড় আদরের, ওর যদি কোনো বিপদ হয়........"

রা বলল, "ওকে দেবেন না। আপনি আমার ওপর দিয়ে সেটা পরীক্ষা করুন!"

"ওরে দুষ্টু মেয়ে। তোমার কোনো বিপদ হলে বুঝি আমার কম কষ্ট হবে?"

নী বলল, "আমায় দিয়ে সেটা পরীক্ষা করা যায় না?"

রা বলল, "তুই চুপ কর তো! তুই বাচ্চা মেয়ে!"

ঝিলম বলল, "আমি কিন্তু আগে বলেছি, আমার দাবি প্রথম।"

হো-সান বললেন, "এখনো আমার মন মানতে চাইছে না। চিন্না-স্বামীকে চেনো তো? সহকারী ছিল এক সময়, তাকে খবর পাঠিয়েছি, সে এলে তাকে সব দিয়ে দেব। সে পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করবে।"

ঝিলম বলল, "আমি কিন্তু আপনার কাছে এই জন্যই এসেছি।"

"চলো, ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি!"

রা আর নী-কে বাইরে রেখে হো-সান ঝিলমকে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঝিলম বেরিয়ে এল প্রায় তিন ঘন্টা পরে। নী আর রা তখন বাড়ির ছাদে প্রচণ্ড শক্তিশালী টেলিস্কোপে অনেক দূরের-দূরের তারা দেখছিল। ঝিলম তাদের ডেকে বলল, "চলো, এবার যেতে হবে!"

বিদায় দেবার সময় হো-সান মিষ্টিমুখ করাবার জন্য প্রত্যেকের হাতে একটি করে মিছরির দানার মতন জিনিস দিলেন। ঝিলম জানে, ঐটুকু জিনিস খেলেই তাদের আর চব্বিশ ঘন্টা খিদে পাবে না। হো-সান আজকাল প্রায় কিছুই খান না। এই গোলকে তাঁর জন্য প্রায় পঞ্চাশ বছরের খাবার মজুত আছে।"

হো-সান শুক্রগ্রহের বন্দীটিকেও এক টুকরো মিষ্টি দিয়েছিলেন। লোকটি এত অভদ্র যে, সেটা না খেয়ে ফেলে দিল।

তাতেও রাগ করলেন না হো-সান। নরম গলায় বললেন, "আপনি এত গোপনীয়তার বোঝা আর কতদিন বয়ে বেড়াবেন? এই রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আপনার ভাল লাগবে? আমরা তো আপনাদের সাহায্য করতেই চাই!"

লোকটা রুক্ষভাবে উত্তর দিল, 'আমার যা হয় হোক, তার জন্য আমি আমার দলের কোনো ক্ষতি করতে চাই না।"

ঝিলম বলল, "দেখা যাক। চলুক তবে ধৈর্যের পরীক্ষা!"

গোলকের একটা অংশ খুলে যেতেই ওরা বেরিয়ে এল বাইরে। রকেটের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে ওরা শেষবারের মতন হাত নেড়ে বিদায় জানাল হো-সানকে। সেই ছোট্টখাটো চেহারার বৃদ্ধ ওদের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে-আস্তে হাত নাড়ছেন।

ভেতরে ঢুকে রকেটটা চালু করা মাত্র চোখের নিমেষে সেটা এত দূরে চলে গেল যে, হো-সানকে আর দেখা গেল না।

ঝিলম বলল, "ধন্যবাদ জিউস! হো-সান তোমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন!"

জিউস বলল, "হো-সান দীর্ঘজীবী হোন!"

নী বলল, "কী চমৎকার মানুষ!"

রা বলল, "আমার খুব মনটা খারাপ লাগছে। ওঁকে আর কোনোদিন দেখতে পাব তো? যতবার দেখি, ততবারই ভয় হয় এরকম একা একা থাকেন!"

বন্দীটিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ইউনুস গিয়ে আবার বসেছে তার মুখোমুখি চেয়ারে।

ঝিলম দু-হাত উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, "আমার কী রকম শরীরটা খারাপ লাগছে!"

রা বলল, "শরীর খারাপ লাগছে, কই দেখি?"

ঝিলমের কপালে হাত রেখে সে আবার বলল, "তোমার তো জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে! তুমি বরং হাসপাতাল-ঘরে গিয়ে একবার দেখিয়ে নাও!"

নী বলল, "ঝিলমদা সেই সে জেনারাল লী পো'র সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তারপর তো আর ঘুমোননি।"

রা বলল, "তাই তো, খুব অন্যায় করেছ ঝিলম! তোমার অন্তত কুড়ি দিন আয়ু খরচ হয়ে গেছে। চলো, হাসপাতাল ঘরে চলো।"

ঝিলম বলল, "তার দরকার নেই। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি আট দিনের জন্য ঘুমের বড়ি খাচ্ছি। ততদিন তুমি আর ইউনুস চালাও। তারপর আমি জাগলে তোমরা ঘুমোতে যাবে। তবে সাবধান, ঐ লোকটার দিকে চোখ রেখো, ও যেন কোনো গণ্ডগোল না করে আবার! চলো নী!"

নী অবাক হয়ে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি শুধু-শুধু জেগে থেকে আয়ু খরচ করবে কেন? তুমিও আমার সঙ্গে ঘুমোবে চলো।"

ইউনুস তার কথা বুঝতে পারবে না বলে একটা কাগজে লিখে ঝিলম সেই কাগজটা দিল ইউনুসের হাতে।

তখন জিউস বলে উঠল, "ঝিলম, তুমি ঘুমোতে যাচ্ছ, কিন্তু রকেটটা এখন কোন দিকে যাবে সেটা বলে দিলে না?"

ঝিলম বলল, "ও হ্যাঁ, আপাতত টিউলিপ নক্ষত্রের দিকে চলুক। ততদিনে যদি আমার ঘুম না ভাঙে, তাহলে মহাকাশ স্পেস স্টেশনে ২ নম্বরের দিকে এগিও। পথে সন্দেহজনক কিছু দেখলেও থামবে না। আমি জেগে উঠলে আবার সেখানে ফিরে আসব।"

জিউস বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের সুনিদ্রা হোক।"

ঝিলম ইউনুসের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বিদায় নিয়ে একবার রা-র কাঁধে হাত রেখে বলল, "সাবধানে থেকো!"

তারপর নী– কে নিয়ে সে চলে গেল ঘুম–ঘরে।

আগেকার পোশাক বদলে দু–জনেই খুব হালকা পোশাক পরে নিল। নী–কে আগে কাচের বাক্সে শুইয়ে তারপর নিজের বাক্সটায় গেল ঝিলম। সাধারণ বিছানার বদলে এই কাচের বাক্সে শুতে হয়, তার কারণ হঠাৎ রকেটের ভেতরটা বেশি ঠাণ্ডা বা গরম হয়ে গেলে সেটা ওরা টের পাবে না। এই ট্যাবলেট–খাওয়া ঘুম মাঝখানে একবার ভেঙে গেলে খুব ক্ষতি হয়।

হাত বাড়িয়ে নী–কে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে বাক্সের ডাল, বন্ধ করবার আগে ঝিলম বলল, "একটা কবিতা শোনাও তো, নী। অনেকদিন তোমার কবিতা শুনিনি।"

নী বললঃ

জলে ভেজা রোদে ভাজা
বরফ–দেশে কাঁপন
আমার আমি তোমার তুমি
সবার চেয়ে আপন
কেউ বা দুখে কেউ বা সুখে
করছে জীবন যাপন
আমার আমি তোমার তুমি
সবার চেয়ে আপন
নদীর পাশে..... নদীর পাশে.....
নদীর পাশে............

আর শেষ করতে পারল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল নী–র।

।।৯।।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে একঘেয়ে লাগল রা–র। ইউনুসের সঙ্গে তো কথা বলার উপায় নেই! কিছুক্ষণ সুইচ টিপে গান শুনল।

শুক্রগ্রহের বন্দীটি বসে বসে ঢুলছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে রা–র একটা কথা মনে হলো। এই লোকটার তো আয়ুক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কিছুদিন ঘুরলেই তো লোকটা বুড়ো হয়ে যাবে।

সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা জিউস, এই লোকটাকে মাঝে–মাঝে ঘুম পাড়িয়ে রাখা উচিত নয়? শুধু–শুধু ওর আয়ু খরচ করে লাভ কী?"

জিউস বলল, "ঝিলম তো কিছু বলেনি।! ঝিলম জেগে উঠুক, তারপর দেখা যাবে।"

"ও ঘুমিয়ে থাকলে তো আমরাও নিশ্চিন্ত। এত পাহাড়া দিতে হয় না!"

"ও ঘুমোলে ইউনুস ওর মনের কথা পড়বার চেষ্টা করবে কী করে?"

"তা ঠিক!"

একবার রা উঠে গেল কফি বানাতে। তিনটে কাগজের গেলাসে কফি এনে একটা দিল ইউনুসকে। আর একটা গেলাস বন্দীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই যে, ডাক্তারবাবু, একটু কফি খান।"

লোকটি চোখ মেলে তাকাল।

ওর হাত বাঁধা, নিজে কফি খেতে পারবে না বলে রা গেলাসটা ধরল ওর মুখের কাছে।

লোকটি মুখের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল গেলাসটা!

রা বলল, "ইশ, দিলে নষ্ট করে? শুক্রগ্রহের মানুষগুলো এত অসভ্য আর গোঁয়ার কেন?"

রা নিজের কফি নিয়ে এসে আবার বসল কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে। দূরে আবার একটা ধূমকেতু দেখা যাচ্ছে। নী জেগে থাকলে খুব আনন্দ পেত।

কফি শেষ করে ইউনুস একবার উঠে গেল। বাথরুমে গেলাসটা ফেলে সে এল ঘুম–ঘরে। নী আর ঝিলম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে রকেটের নানান ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর একসময় ইউনুস এসে দাঁড়াল কন্ট্রোল রুমে রা–র পাশে। রা মুখ তুলে তাকাতেই ইউনুস রা–র হাত–ব্যাগটা তুলে নিল এক হাতে।

রা জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, ইউনুস? তুমি কিছু চাইছ?"

ইউনুস হঠাৎ কথা বলে উঠল।

সে গম্ভীরভাবে বলল, "এবার আমি এই রকেটটার দখল নিচ্ছি! তুমি উঠে এসো, রা—।"

রা বলল, "তুমি কন্ট্রোল বোর্ডে বসবে? আমার পাশে এসে বোসো না!"

ইউনুসের এক হাতে ছোট্ট একটা রিভলভার। সেটা উঁচু করে সে আবার বলল, "আমার কথা শুনতে পাওনি? উঠে এসো! কোনো রকম বাধা দেবার চেষ্টা করলেই মরবে!"

রা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসতে–হাসতেই বলল, "বাবা রে বাবা, অদ্ভুত তোমার ঠাট্টা! এতদিন পর কথা বলতে শুরু করেই তুমি এমন ভয় পাইয়ে দিলে—"

ইউনুস খপ করে রা–র চুলের মুঠি চেপে ধরে কর্কশ গলায় বলল, "ঠাট্টা! আমি অনেক দিন সহ্য করেছি! তোমরা আমার সঙ্গে চাকরের মতন ব্যবহার করো.......।"

রা এবার ধমক দিয়ে বলল, "কী হচ্ছে ইউনুস?" এরকম ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না! চুল ছেড়ে দাও।"

ইউনুস এবার প্রচণ্ড জোরে রা–র মুখে একটা চড় কষাল! দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ফের আমার সঙ্গে ঐ রকম সুরে কথা বলছ? আমি তোমাদের চাকর? ঝিলম মনে করে চিরকাল আমি ওর সহকারী থেকে যাব? প্রাণে বাঁচতে চাও তো উঠে এসো, এই রকেট এখন আমার!"

চড় খেয়ে রা হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ইউনুসের মুখের দিকে। এত জোরে কেউ তাকে কখনো মারেনি। ইউনুসের মুখখানা হিংস্র হয়ে গেছে, সে কটমট করে চেয়ে আছে রা–র দিকে।

রা এবার বলে উঠল, "জিউস, কী ব্যাপার? ইউনুস কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল?"

জিউস কোনো উত্তর দিল না

ইউনুস বলল, "জিউসকে আমি আগেই ঠাণ্ডা করে রেখেছি। ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। আমি পাগল! আমাকে তোমরাই জোর করে নিঃশব্দ–বড়ি

খাইয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিলে। যাতে আমি কোনো কথা বলতে না পারি, শুধু তোমাদের হুকুম মেনে চলব। ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই ঝিলমকে আমি খুন করব।"

"ইউনুস, কী বলছ?"

"একটু পরেই দেখতে পাবে, আমি কী করি!"

শুক্রগ্রহের বন্দীটি প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছে। তার দিকে ফিরে ইউনুস বলল,"আমি তোমার মনের কথা সব জেনে গেছি। তোমরা নটিলাস নামে একটি রকেটে চেপে সূর্যমণ্ডলের বাইরে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ একটা মৃত নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছ। সেই নক্ষত্রটিতে দুটি বিরাট সোনার পাহাড় আছে, সে এত সোনা যে, পৃথিবীর মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। নিজেদের চেনাশুনো আড়াইশো লোক নিয়ে তোমরা আস্তে-আস্তে সেই নক্ষত্রে একটা আস্তানা তৈরি করেছ। সেই সোনা নিয়ে গিয়ে এর পর তোমাদের দলটাই পুরো শুক্রগ্রহের মালিক হতে চাও, তাই না?"

লোকটি বলল, "সোনার পাহাড়, হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! তার আবার হয় নাকি?"

"তোমরা সেই গ্রহটার নাম দিয়েছ মিডাস। প্রথমবার সোনা তুলতে গিয়ে সেখানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। সেখানে যে হিলিয়াম গ্যাস ছিল, তোমরা জানতে না সেই বিস্ফোরণে তোমাদের দলের প্রায় দেড়শোজন লোকের চোখ অন্ধ আর কান কালা হয়ে গেছে। তারাই তোমাদের প্রথম সারির বিশিষ্ট লোক। আমার কাছে আর লুকোবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।"

"ধরো যদি তোমার কথা সত্যি হয়, তাতেই বা কী হবে?"

"এখন তোমার জীবন নির্ভর করছে আমার হাতে। তোমাকে আমি এই মুহূর্তে রকেট থেকে ফেলে দিতে পারি। আবার তোমাকে বাঁচাতে পারি একটি শর্তে। মহাশূন্য স্টেশন আর্মস্টং-এ তুমি কালো নার্স-মেয়েটিকে তার দেহের ওজনের সমান সোনা দিতে চেয়েছিলে তোমার মুক্তির বিনিময়ে। তুমি যদি আমার দেহের ওজনের সমান সোনা দাও আমাকে, তা হলে আমিও তোমাকে মুক্তি দেব।"

"মুক্তি দেবে মানে?"

"তোমাকে ঐ মিডাস নক্ষত্রে পৌঁছে দিয়ে আসব। সেখান থেকে তুমি আমায় সোনাটাও দিয়ে দেবে। তোমাদের ঐ নক্ষত্রের কথা আর কারুকে জানাব না। সে-প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি।"

"তোমার কথায় বিশ্বাস কী?"

"আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে। আসলে মহাশূন্যে ওড়াউড়ি করতে আমার আর ভাল লাগে না। ঐ সোনাটা পেলে আমি নিজের দেশে ফিরে গিয়ে আরামে জীবন কাটাতে চাই।"

"ঠিক আছে, রাজি!"

রা বলে উঠল, "খবর্দার ইউনুস, ওকে তুমি বিশ্বাস কোরো না। তুমি কী ছেলেমানুষি করছ, ইউনুস? ওদের নক্ষত্রে একবার গেলেই ও আমাদের সবাইকে বন্দী করবে। তোমাকেও ছাড়বে না। ঝিলম এখন জেগে নেই—"

ইউনুস গর্জন করে বলল, "তুমি চুপ করো! ঝিলম জেগে নেই! ঝিলমই বেশ সবকিছু পারে! আমার কোনো বুদ্ধি নেই?"

ইউনুস এগিয়ে গিয়ে শুক্রগ্রহের মানুষটির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

রা চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে হাত চাপা দিল নিজের মুখে। কী বোকামী করছে ইউনুস! ঐ হিংস্র লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় কখনো?

ইউনুস লোকটিকে বলল, "এই সুতো দিয়ে এবার ঐ মেয়েটির হাত-পা বেঁধে ফেল। তারপর তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা হবে।"

লোকটি এসে রা-র হাত পা বেঁধে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। রা কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করল না। কারণ, কোনো লাভ নেই। ইউনুস আগেই তার হাত-ব্যাগটা কেড়ে নিয়েছে। কোনো অস্ত্র নেই তার কাছে এখন। লোকটা তাকে টানতে-টানতে নিজের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল।

ইউনুস বলল, "এবার তুমি আমার কাছে এসে বোসো—"

ইউনুসের হাতে তখনও সেই রিভলভার। সেটা দেখিয়ে বলল, "এবার এটা পকেটে ভরে রাখতে পারি। রিভলভার উঁচিয়ে কোনো সন্ধির কথা আলোচনা করা যায় না। তুমি হঠাৎ আমায় আক্রমণ করার চেষ্টা করবে না আশা করি। কারণ তাতে কোনো লাভ নেই। এই রকেটটা এমনভাবে তৈরি যে, এটা আমি, ঐ মেয়েটি আর ঝিলম ছাড়া আর কেউ চালাতে পারবে না। তুমি যদি এখন হঠাৎ আমায় মেরে ফেলো, তা হলে তোমাকে অনন্তকাল মহাশূন্যে ঘুরতে হবে।"

লোকটি বলল, "বুঝলুম। তোমাকে মারব কেন, তোমার প্রস্তাবে তো আমি রাজিই হয়েছি! তুমি যা চাইলে, তার দ্বিগুণ সোনা দিতে রাজি আছি, যদি তুমি আমাদের আরও কিছু দাও।"

"কী?"

"এই দুটি মেয়ে আর অন্য লোকটিকেও আমাদের মিডাস-এ নামিয়ে দেবে! ওদের চোখ আর কানের পর্দাগুলো আমাদের চাই!"

"বেশ তো! ওদের আমি এমনিই ফেলে দিতাম। আমি যখন ফিরে যাব, তখন বলব, ওরা শুক্রগ্রহের লোকদের হাতে ধরা পড়েছে। কেউ আমার কথা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার চোখ আর কানের পর্দার ওপরেও তোমাদের লোভ নেই তো? আমাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবে না?"

"না, না!"

এই সময় রা হঠাৎ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ইউনুস দারুণ বিরক্ত ভাবে বলল, "আঃ! এইজন্যই মেয়েগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না। একটু বিপদের গন্ধ পেতে-না-পেতেই ছিঁচকাঁদুনের মতন ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কাঁদতে শুরু করে। কেঁদে আর কোনো লাভ নেই। বুঝলে রা? আমি বেশি রেগে গেলে এখুনি তোমার চোখ উপড়ে নিতে বলব এই বলব এই ডাক্তারকে।"

রা কান্না থামিয়ে মুখ তুলে বলল, "বিপদের ভয়ে আমি কাঁদিনি, ইউনুস। আমি আর ঝিলম তোমাকে কত ভালবাসি, তুমি আমাদের কত দিনের বন্ধু, দুঃখ-সুখে

কতদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, সেই তুমি সামান্য সোনার লোভে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মায়া, এসবই তুচ্ছ হয়ে গেল সোনার জন্য?"

ইউনুস বলল, "আমার এখন কাজের কথা বলছি। তো মরা বক্তৃতা থামাও! ভেবো না, তোমার ঐ প্যানপ্যানানি শুনে আমি গলে যাব! লোকে চাকর-বাকরকে যেমন ছিটেফোঁটা ভালবাসে, তোমরা সেইরকম ভালবাসতে আমাকে!"

শুক্রগ্রহের লোকটির দিকে তাকিয়ে ইউনুস বলল, "এক কাজ করলে হয় না? রা-কেও ঘুম-ঘরে নিয়ে গিয়ে যদি বন্ধ করে দিই? তারপর ও-ঘরের বাতাস কমিয়ে দিলেই ওরা মারা যাবে। তাই করা যাক বরং। ঝিলম হঠাৎ জেগে উঠলে বিপদ হতে পারে। সে-ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। মরা মানুষের চোখও তো কাজ লাগে!"

শুক্রগ্রহের লোকটি বলল, "কোনো কারণে দেরি হয়ে গেলে আর কাজে লাগে না। এক্ষুনি মেরে ফেলার দরকার নেই। ঐ ঝিলম তো আট দিনের জন্য ঘুমের বড়ি খেয়েছে, অর্থাৎ রকেটের ভেলোসিটি অনুযায়ী আট ঘন্টা, তার অনেক আগেই আমরা মিডাসে পৌঁছে যাব।"

ইউনুস বলল, "তা হলে শোনো, আমি কী ব্যবস্থা নিতে চাই। প্রথমে মিডাসে পৌঁছে আমি ওদের তিনজনকে সেখানে ফেলে দেব ওপর থেকে। আমার রকেট সেখানে নামবে না। তুমি তখনও ছাড়া পাবে না। তুমি খবর পাঠাবে সোনাটা কাছাকাছি কোনো গ্রহে কিংবা নক্ষত্রে পৌঁছে দিতে। মিডাসের সবচেয়ে কাছে কোন্ গ্রহ বা নক্ষত্র আছে?"

লোকটি বলল, "একদিকে সেন্ট মেরি নক্ষত্র আর একদিকে পীর জালাল নক্ষত্র। দুটোই সমান দূরত্বে প্রায়।"

রা অস্ফুট গলায় বলল, "সেন্ট মেরি!"

ইউনুস রা-র দিকে ফিরে কঠোরভাবে বলল, "ফের যদি আমাদের কথার মাঝখানে একটাও কথা বলো, তা হলে তোমায় ঘুম-ঘরে আটকে রাখতে বাধ্য হব।"

শুক্রগ্রহের লোকটি রা-কে বলল, "ওহে মেয়ে, বুঝতেই তো পারছ, আর তোমাদের মুক্তি পাবার আশা নেই। তুমি যদি আমার কথা শোনো তা হলে তোমার চোখ দুটো তুলে নেব না! মিডাসে আমাদের দলে মেয়ের সংখ্যা খুব কম। তোমার মতন একটি সুন্দরী মেয়েকে আমরা দলে নিতে রাজি আছি। তুমি সেখানে রানীর মতন থাকবে।!"

রা জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের মিডাসে নামবার আগেই আমার মৃত্যু হবে। তোমরা কিছুতেই জ্যান্ত অবস্থায় আমার চোখ নিতে পারবে না। আমি ইচ্ছে করলেই যখন খুশি মরে যেতে পারি!"

ইউনুস বলল, "যাক, ও-সব কথা বলে লাভ নেই ওর সঙ্গে। এসো, আমরা কাজের কথা সেরে নিই। সেন্ট মেরি নক্ষত্রটা মহাকাশ-ম্যাপে আছে। সুতরাং সেখান থেকে রাস্তা চিনে ফিরতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। তোমাদের মিডাসের ওপরে গিয়ে প্রথমে আমরা ওদের তিনজনকে নিচে নামিয়ে দেব। তুমি খবর পাঠাবে সোনাটা সেন্ট মেরিতে পৌঁছে দিতে। সেখানে সোনা রেখে তোমাদের লোকজন চলে গেলে তারপর আমি সেখানে টাচ-ডাউন করব। সোনা নিয়ে সেখানে আমি রেখে আসব তোমাকে। তারপর যথাসময়ে তোমাদের রকেট আবার তোমায় নিয়ে যাবে! এই ব্যবস্থা ঠিক আছে?"

লোকটি বলল, "তুমি দেখছি, এখনো আমাকে অবিশ্বাস করছ!"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। দু'দিক থেকেই বন্দোবস্তটা পাকা করে রাখা দরকার। নিজের চোখ দুটোর ওপর আমার মায়া আছে। সব কিছু হয়ে যাবার পর হঠাৎ তোমাদের দলের অন্য লোকেরা যদি আমার চোখ দুটোও লোভ করে নিয়ে নিতে চায়, তখন আমি বাধা দেব কী করে? সেইজন্যই তোমাদের মিডাসে আমি নামতেই চাই না। আমার রকেটের তিনজন লোককে প্রথমেই আমি নামিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আমাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই তোমাদের।"

"তোমার বন্ধু ঐ ঝিলমের চেয়ে তোমার বুদ্ধি অনেক বেশি, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য!"

" তা হলে এই যুক্তিই ঠিক রইল? এসো, হাতে হাত মেলাও!"

দু'জনে দু'জনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল আন্তরিকভাবে। রকেটের মুখ ঘুরে গেল। শুক্রগ্রহের লোকটি নির্দেশ দিয়ে দিল গতিপথের। তারপর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "অনেকদিন বাদে আমি মিডাসে নিজের লোকজনদের মুখ দেখব! ধন্যবাদ তোমাকে। এবার আমি একটু কফি খেতে চাই!"

ইউনুস বাঁ হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ঐ তো পাশেই রান্নাঘর তুমি নিজেই বানিয়ে নিয়ে এসো না!"

লোকটি উঠে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকার আগে একবার ঘুম-ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল ঘুমন্ত নী আর ঝিলমকে। তারপর রান্নাঘরে এসে কফি বানাতে-বানাতে গপ্ গপ্ করে খেয়ে নিল কয়েকটা বিস্কুট আর স্যাণ্ডউইচ। ধরা পড়ার পর থেকে সে কিছুই খায়নি।

লোকটি চলে যেতেই রা ফিসফিস করে বলল, "ইউনুস, ইউনুস এখনো ভেবে দ্যাখো, তুমি কী সর্বনাশ করছ। সোনার লোভে মানুষের কত সর্বনাশ হয়েছে, তুমি জানো না? তুমি যদি দেশে ফিরে গিয়ে আরামে থাকতে চাও, এই রকেটটা বিক্রি করে সব টাকা আমরা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি!"

ইউনুস উঠে গিয়ে রা-র মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হিংস্র গলায় বলল "ফের একটা কথা বললে লাথি মেরে আমি তোমার মুখ ভেঙে দেব! তোমাকে দেখলেই রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে! রকেট বিক্রি করে সেই টাকা আমাকে দেবে, আমি কি ভিখিরি? এই রকেটটা তো এখন আমারই!"

দু'গেলাস কফি হাতে নিয়ে শুক্রগ্রহের লোকটি সেই অবস্থায় ইউনসুকে দেখে বলল, "আহা-হা, মিঃ ইউনুস, ওকে মেরো না! ওর চোখে যদি হঠাৎ আঘাত লাগে, আমাদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। ওরকম ভাল চোখ সহজে পাওয়া যায় না।"

রা শান্ত গলায় বলল, "থেমে গেলে কেন ইউনুস? তুমি আমায় লাথি মারো। একজন বন্ধুর কাছ থেকে কতটা নির্দয় ব্যবহার পাওয়া সম্ভব, আমি তা দেখতে চাই!"

শুক্রগ্রহের লোকটি হাত ধরে টেনে নিয়ে এল ইউনুসকে। সে তখনও রাগে ফুঁসছে। কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে দুটি আসনে দু'জনে বসল আবার। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কফি পান করল।

সেন্ট মেরি নক্ষত্রটি মহাকাশ-মানচিত্রে আছে। খুব সাধারণ একটি ছোট আকারের নক্ষত্র, জল নেই, হাওয়া নেই, মূল্যবান কিছুই নেই, তাই ওটাতে কেউ নামে না। তার কাছেই যে মৃত নক্ষত্রটির নাম শুক্রগ্রহের এই অভিযাত্রী দল রেখেছে মিডাস, সেটাকে এতদিন কেউ লক্ষ করেনি, কারণ সেটা ধোঁয়ায় ঢাকা। একটা মৃত নক্ষত্র নিয়ে কেউ বা মাথা ঘামায়, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে মহাকাশে। তা ছাড়া দূর থেকে ওটাকে দেখায় একটা ধূমকেতুর খসে পড়া লেজের মতন।

সেখানে পৌঁছে সেই ধোঁয়ার আস্তরণে ঢোকার পর আবছা ভাবে দেখা গেল নক্ষত্রটিকে।

শুক্রগ্রহের লোকটি দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বলল, "এই যে এসে গেছি! ভাবতেই পারিনি, আর কোনোদিন এখানে বেঁচে ফিরে আসতে পারবো!"

ইউনুস বলল, "দাঁড়াও, আগে ভাল করে দেখে নিই!"

একটা জুম টেলিস্কোপে চোখ লাগাতেই দৃশ্যটা অনেক কাছে চলে এল! তারপরই সে বলে উঠল, "আশ্চর্য! আশ্চর্য! এরকম কখনো জীবনে দেখিনি!"

একটা নীল রঙের হ্রদের পাশে দুটি টিবির মতন গোল পাহাড়। সোনার রং ঠিকরে বেরুচ্ছে সেই পাহাড় দুটি থেকে। নীল হ্রদটির পাশে পাশে অনেকগুলো তাঁবু। সোনার পাহাড় দুটির চূড়া থেকে উঠে আসছে পিচকিরির রঙের মতন নীল আলো। ঠিক যেন স্বপ্নের মতন এক অপরূপ ছবি।

শুক্রগ্রহের লোকটি বলল, "এবার বুঝলে, কেন এই জায়গাটার কথা আমরা গোপন রাখতে চাই?"

টেলিস্কোপ থেকে চোখ তুলে এনে ইউনুস বলল, "এবার কাজ শুরু করতে হবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে আর-একজন বলল, "হ্যাঁ, এবার কাজ শুরু করতে হবে!"

শুক্রগ্রহের লোকটি আর ইউনুস মুখ ফিরিয়ে দেখল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঝিলম। তার হাতে একটি ছোট্ট রিভলবারের মতন অস্ত্র।

॥১০॥

ইউনুসও তক্ষুনি পকেট থেকে তার ছোট্ট রিভলবারটা বার করে শুক্রগ্রহের লোকটির বুকে ঠেকিয়ে বলল, "হাত তুলে দাঁড়াও! কোনো রকম এদিক-ওদিক করলেই তোমায় গুঁড়িয়ে দেব! আমাদের এই অস্ত্র দিয়ে গুলি বেরোয় না। কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু চোখের নিমেষে তোমায় ধুলো করে দিতে পারি!"

শুক্রগ্রহের লোকটি এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না! এত কাছে এসে এরকম পরাজয়! সে প্রায় তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "তু.....তুমি.....আ..... আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?"

ইউনুস হেসে উঠে বলল, "ডাকাতের সঙ্গে আবার বিশ্বাসঘাতকতা কী? তুমি না বলেছিলে, তোমাদের এই জায়গাটার কথা আমরা কোনোদিন জানতে পারব না?"

রা-ও এত অবাক হয়ে গেছে যে, সে-ও কোনো কথা বলতে পারছে না।

ঝিলম এসে রা-র বন্ধন খুলে দিল। রা উঠে দাঁড়িয়ে ঝিলমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতন তাকে কিল মারতে মারতে বলল, "তোমরা দু'জনে আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছিলে, আমাকে বলোনি কেন? কেন? কেন?

ঝিলম হাসতে হাসতে বলল, "ওরে বাবা, লাগছে, লাগছে! এখনও অনেক কাজ বাকি আছে রা! তোমাকে আগে বলিনি, তা হলে তুমি এমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারতেনা।"

ইউনুস বলল, "ওরকম ভাবে কাঁদতে পারতে, রা? তোমার কান্না দেখেই লোকটা আরও বিশ্বাস করেছিল আমার কথা! তোমার চুলের মুঠি ধরেছি, চড় মেরেছি, লাথি মারার জন্য পা তুলেছি, এগুলো সব আমার পাওনা রইল। তুমি একসময় শোধ দিয়ে দিও!"

শুক্রগ্রহের লোকটি ইউনুসের হাতে ওরকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর! ঝিলম বিদ্যুতের মতন লাফিয়ে এসে নিজের হাতের

অস্ত্রটা দিয়ে খুব জোরে মারল লোকটির মাথায়। সেই এক আঘাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল লোকটি। তার হাত পা বেঁধে ফেলা হল। তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে ঝিলম তার হাতে একটা ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দিল, এর পর বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আর কিছুতেই ও ঘুম ভাঙবে না।

ইউনুসের পিঠে হাত দিয়ে ঝিলম বলল, "তুই অদ্ভুতভাবে লোকটাকে বিশ্বাস করিয়েছিস, এত সহজে যে কাজ হবে আমি ভাবতেই পারিনি। আমি এত ভাল অভিনয় করতে পারতুম না।"

জিউস এবার বলে উঠল, "রকেটটা আরও উঁচুতে তুলে নাও ঝিলম, ওরা মিজাইল ছুঁড়তে পারে।"

রা বলল, "জিউস তা হলে ঠাণ্ডা হয়নি! জিউসও জানত?"

ঝিলম বলল, "জিউসও ভাল অভিনয় করেছে। ধন্যবাদ জিউস।"

রা প্রচণ্ড অভিমানের সঙ্গে বলল, সবাই জানত, শুধু আমায় জানাওনি। নী-ও জানে নিশ্চয়ই।"

ঝিলম বলল, "না। নী-কে সত্যিই ঘুমের বাড়ি খাইয়ে দিয়েছি। আমি নিজে খাইনি।"

ইউনুস বলল, "কাজ শুরু করে দাও, রা। এই জায়গাটার সঠিক অবস্থান হিসেব করো। ও-কাজটা তুমি ভাল পারো আমাদের চেয়ে।"

ঝিলম বলল, "ব্যস্ততার কিছু নেই সেজন্য অনেক সময় আছে তোমাদের হাতে।"

ইউনুস বলল, "তার মানে? আমাদের এক্ষুনি ফিরে যাওয়া উচিত না? রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঝটিকা-বাহিনীকে খবর দিলে তারা এসে যা করার করবে!"

ঝিলম বলল, "হ্যাঁ, ঝটিকা-বাহিনীকে খবর দিতে হবে ঠিকই। কিন্তু তার আগে আমার আর একটা কাজ বাকি আছে।"

"তোর কাজ? তার মানে?"

'রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্য যা দরকার, তা আমরা করেছি ঠিকই। এবার হো-সানের কাজ বাকি আছে। তিনি যে প্রতিরোধ শক্তি আবিষ্কার করেছেন, সেটা পরীক্ষা করার এটাই তো সেবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা?"

"তুই কী বলতে চাইছিস, ঝিলম?"

"আমি এখন একা ঐ মিডাসের লোকজনের মধ্যে নামব। যদি ওরা আমায় মেরে ফেলতে না পারে, তাহলেই বোঝা যাবে হো-সানের আবিষ্কার সার্থক।"

'তুই ওখানে একা নামবি?"

ঝিলম বলল, "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? হো-সান কখনো ব্যর্থ হতে পারেন না। আমি তাঁর কাছ থেকে ফর্মুলা নিয়ে এসেছি। সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখবই। যদি

আমি ব্যর্থ হই, তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে হো-সানকে খবর দেবে। তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতেই যাতে আবার গবেষণা করে জিনিসটাকে একেবারে পারফেক্ট করে তুলতে পারেন।"

রা কাতর গলায় বলল, "এখন এই পরীক্ষাটা থাক ঝিলম। এই ক'দিনে আমাদের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আর সহ্য করতে পারছি না। এবার ফিরে চলো, পরে অন্য কোনো সময় ঐ পরীক্ষা করো তুমি!"

রা-র পিঠে হাত রেখে ঝিলম খুব নরম গলায় বলল, "তুমি তো আমায় জানো রা। আমি একবার কোনো কিছু ঠিক করলে আর ফিরি না। আমার মতন গোঁয়ার-গোবিন্দকে বাধা দিয়ে কোনো লাভ আছে?"

ইউনুস বলল, "আমরা তোকে কিছুতেই এভাবে একা যেতে দিতে পারি না, ঝিলম। ওরা সাংঘাতিক লোক!"

রা বলল, "হো-সান নিজেই বলেছেন, তাঁর এই প্রতিরোধ-শক্তি পুরোপুরি সফল কি না তিনি নিজেও জানেন না।"

ঝিলম বলল, "হো-সানের গবেষণার তুলনায় আমার জীবনের দাম অতি সামান্য। শুধু-শুধু আর দেরি করে লাভ নেই। যেতে আমাকে হবেই। আমি এখান থেকে নামব প্যারাসুটে। তোমাদের সঙ্গে আমার রেডিও যোগাযোগ থাকবে। ঠিক এক ঘন্টা পর তোমরা একটা মনো-ইউনিট নামিয়ে দেবে নিচে। সেটাতে যদি আমি না ফিরি কিংবা তোমাদের সঙ্গে যদি আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আর দেরি না করে তক্ষুনি ফিরে যাবে তোমরা। প্রথমে খবর দেবে ঝটিকা-বাহিনীকে। তারপর হো-সানের কাছে খবর পাঠাবে।"

প্যারাসুট পরে নিয়ে ঝিলম ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হল। কোনো-রকম বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ নেই তার। সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো আর একটা সাদা ঝোলা কোট, তাতে অনেকগুলি পকেট।

ঝিলম রকেটের দরজা খুলতেই ইউনুস তার হাত ছুঁয়ে বলল, "সাবধান, ঝিলম।"

ঝিলম বলল, "চিন্তা করিস না, ইউনুস।"

রা আর কোনো কথা বলতে পারছে না। ঝিলম তার একটা হাত কোলে নিয়ে মুঠোয় চেপে ধরে বলল, "রা মনে নেই, বিয়ের সময় আমরা বলেছিলুম, আমরা দু'জনেই কেউ কখনো মৃত্যুকে ভয় পাব না।।"

তারপর ইউনুসের দিকে ফিরে বলল, "ইউনুস, তোর ওপর সব ভার রইল। আমি যদি আর না ফিরি···তুই ওদের দেখিস।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঝিলম।

এখানকার আবহমণ্ডলে বাতাস নেই। ঝিলম অক্সিজেন বাড়ি খেয়ে নিয়েছে আগেই। এই প্যারাসুটও যে-কোনো পরিবেশে নামার মতন করে তৈরি। তার ঐ

কোটের প্রত্যেকটি বোতামই একটা করে যন্ত্র, তার মধ্যে একটি বোতম রকেটের সঙ্গে রেডিও-যোগাযোগ রাখছে।

দুলতে-দুলতে নামতে লাগল ঝিলম। এই প্যারাসুটে ইচ্ছে মতন দিক বদলানো যায়। নিচের নীল জলের হ্রদে গিয়ে যাতে না পড়ে, সেই ভাবে ঝিলম সরে-সরে যেতে লাগল। সোনার পাহাড় দুটোর দিকে সে তাকাতে পারছে না, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে সোনা মিশে থাকে পাথরের মধ্যে, অনেক কষ্ট করে বার করতে হয়। এরকম খাঁটি সোনার পাহাড় যে কোথাও থাকা সম্ভব, সে আগে কল্পনাও করেনি। এখানকার খুঁটিনাটি সবকিছু হো-সান বলে দিয়েছেন তাকে। ইউনুস ঐ শুক্রগ্রহের লোকটির মনের কথা সবটা জানতে পারেনি। হো-সান এক নজর দেখা মাত্র সব জেনে গিয়েছিলেন। সব কথা ঝিলম একটা কাগজে লিখে ইউনুসকে দিয়েছিল।

মিডাস উপনিবেশের বহু লোক তাঁবু ছেড়ে চলে এসেছে বাইরে। তারাও অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওপরের দিকে। একা একজন মানুষ প্যারাসুটে নামছে, তারা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

ঝিলম এসে নামল হ্রদটার পাশে। প্যারাসুটের বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একদল লোক একটু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। তাদের সকলেরই হলদে চুল। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক অন্ধ।

ঝিলম হাত তুলে বলল, "আমি পৃথিবীর মানুষের দূত হয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। আপনারা মহাকাশে অশান্তির সৃষ্টি করেছেন। জীবন্ত মানুষের চোখ ও কানের পর্দা তুলে আনছেন ডাকাতি করে। আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। আপনাদের পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে চোখ ও কানের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলব।"

ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এল মধ্যবয়স্ক লোক। এর এক চোখ কানা, সারা মুখে পোড়া-পোড়া দাগ। শুক্রগ্রহের সাদা ভাল্লুকের চামড়ায় তৈরি পোশাক পরা। লোকটি বলল, "পৃথিবীর লোক! হ্যাঁ, কালো চুল দেখছি। একটা শিকার তা হলে নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে। একে বাঁধো।"

ঝিলম বলল, "আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।"

তিনজন লোক মোটা শিকল হাতে নিয়ে এগিয়ে এল ঝিলমের দিকে। শিকলটা সোনারতৈরি।

ঝিলম হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বলল, "আমায় ধরুন তা হলে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝিলমের গা থেকে একরকম জ্যোতি বেরুতে লাগল। সেই জ্যোতি ঘিরে রইল তার সারা দেহ। আগেকার দিনের গল্পের বইয়ের ছবিতে যে-রকম দেবতাদের আঁকা হত, ঝিলমকে দেখাতে লাগল সেই দেবতাদের মতন।

শিকল ঝনঝনিয়ে তিনটি লোক ঝিলমের তিন হাত দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তারা এগুতে পারছে না। লোকগুলো যেন চুম্বকে আটকে গেছে।

ঝিলম হাহা করে হেসে উঠে বলল, "বললাম না, আমাকে আপনারা বন্দী করতে পারবেন না। ওহে শুক্রগ্রহের মানুষ, সোনার লোভে আপনাদের কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি কি আপনাদের কাছে কোনো অন্যায় কথা বলেছি যে আমায় বাঁধতে চাইছেন?"

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন মোটামতন লোক বেরিয়ে এসে হুংকার দিয়ে বলল, "এই লোকটা আমাদের ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ওসব ম্যাজিক আমি গ্রাহ্য করি না। ওকে আমি ঝাঁঝরা করে দিচ্ছি।"

লোকটার হাতে একটা সাব মেশিনগান। র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট করে লোকটা এক ঝাঁক গুলি চালিয়ে দিল। অত গুলিতে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষের মরে যাবার কথা, কিন্তু ঝিলমের শরীরে একটাও লাগল না। ঠিক যেন কোন অদৃশ্য নিরেট দেওয়ালে বাধা পেয়ে গুলিগুলো উঠে গেল শূন্যে।

ঝিলম আবার হেসে বলল, "ঐ সব পুরনো অস্ত্র দিয়েই যদি আমায় মারা যেত, তা হলে আর আমি এখানে এসেছি কেন?"

এবার কিছু লোক হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল সবই ফিরে যেতে লাগল তাদের দিকে।

এক চোখ-কানা লোকটি বলল, "দাঁড়াও। ওকে কী করে শেষ করতে হয় আমি দেখাচ্ছি। ডিনামাইট স্টীক নিয়ে এসো।"

ঝিলম হাসিমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোনার পাহাড় কাটবার জন্য ওদের কাছে অনেক ডিনামাইট স্টীক মজুত আছে। ঝিলমকে ঘিরে গোল করে সাজাল অনেকগুলো ডিনামাইট স্টীক। তারপর সবাই অনেক দূরে সরে যাবার পর একজন চার্জ করল ডিনামাইট। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হল একটা, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হল পাহাড়ে-পাহাড়ে। ঝিলম লেলিহান আগুনের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে আগুন সরে গেলে দেখা গেল ঝিলম একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। তার সাদা পোশাকে একটা কালো দাগ পর্যন্ত লাগেনি।

ঝিলম বলল, "আর কোনো অস্ত্র নেই?"

এবারে সবার গলা থেকে একটা ভয়ের আওয়াজ বেরিয়ে এলো। অনেকের ধারণা হলো ঝিলম কোনো জীবন্ত মানুষ নয়, একটা থ্রী ডি প্রতিচিত্র। অন্য কোনো উন্নততর সভ্যতা থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে।

সবাই পালিয়ে যাচ্ছে দেখে ঝিলম এগিয়ে এল তাদের দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেননি যে, আমি কোনো প্রতি-আক্রমণ করার চেষ্টা করছি না। আমার কোনো অস্ত্র দিয়ে আপনাদের মেরে ফেলছি না। আমি কোনো

অন্যায় কথা বলছি না বলেই আপনারা আমাকে মারতে পারছেন না। এখনো বলুন, আপনারা আত্মসমর্পণ করতে চান কি না!"

কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করল না।

ঝিলম বলল, "এখন আমি আপনাদের রকেট স্টেশনের দিকে যাচ্ছি। যদি সাধ্য থাকে তো আমাকে আটকান।"

হ্রদটা ঘুরে একটা স্বর্ণ-পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগল ঝিলম। ওপর থেকে নামবার সময়ই সে দেখে নিয়েছে, এখানে কোথায় কী আছে। মিডাস নক্ষত্রটি খুবই ছোট। এই হ্রদ ও সোনার পাহাড় দুটি ছাড়া বাকি সবটাই এবড়ো-খেবড়ো ভূমি। প্রায় তিনশো তাঁবু খাটিয়ে শুক্রগ্রহের অভিযাত্রীরা এখানে উপনিবেশ গড়েছে। বোঝাই যায়, এখানে তারা বেশি দিন আসেন নি। আসার পরই দুর্ঘটনায় অর্ধেকের বেশি লোক অন্ধ হয়ে গেছে আর কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে। সুতরাং ভাল করে এখানকার কাজই শুরু হয়নি বলা যায়।

একটি সোনার পাহাড়ের পিছনে রকেট স্টেশন। ঝিলম সেদিকে যাবার আগেই একদল লোক একটা মোটা পাইপ এনে আগুনের হল্কা ছুঁড়তে লাগল তার দিকে। সোনার পাহাড় দুটির ওপরের গর্ত দিয়ে অনবরত নীল রঙের আগুন বেরিয়ে আসছে। ওরা ঐ পাইপটার একটা মুখ জুড়ে দিয়েছে পাহাড়ের সেই আগুনের শিখার সঙ্গে।

সেই আগুনের ধাক্কায় ঝিলম পুড়ে গেল না বটে, কিন্তু ছিটকে গিয়ে পড়ল হ্রদের জলে। আর পড়া মাত্র ডুবে গেল সে। শুক্রগ্রহের লোকগুলি এবার আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

ঝিলম চলে গেল একেবারে তলায়। এই হ্রদে কোনো প্রাণী নেই। এখানে এই জল কবে থেকে জমে আছে কে জানে! ঝিলম দেখল হ্রদের তলাটাতেও রয়েছে কোনো চকচকে ধাতু। এই ছোট্ট মৃত নক্ষত্রটি সত্যি খুব দামি।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে হস্ করে ঝিলম ভেসে উঠল অনেক দূরে। হ্রদের অন্য পারে উঠে সে বলল, "ঐ আগুনটা আর একবার নিয়ে আসুন, আমার জামা-কাপড় শুকানো দরকার!"

অবশ্য ঝিলমের পোশাক একটুও ভেজেনি। কোনো একটা অদৃশ্য তেজ তার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। জলও তাকে ছুঁতে পারছে না। সবচেয়ে বড় কথা তার মনটা খুব হালকা হয়ে আছে, আগুন বা ডিনামাইট দেখেও একটুও ভয় জাগেনি। সে এগিয়ে যেতে লাগল সেই সোনার পাহাড়টির দিকে, যার পেছনে রকেট স্টেশন। শুক্রগ্রহের লোকগুলি ভয়ে-ভয়ে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল তাকে।

সেই সোনার পাহাড়টির গায়ে একটি প্রকাণ্ড বড় খাদ। এখানেই প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তখন ওরা জানত না এখানে বিষাক্ত গ্যাস আছে। বিস্ফোরণ যে অত প্রচণ্ড হবে, সেইজন্যই তা ওরা বুঝতে পারেনি।

খাদের ধারে পাথরের টুকরো মতন সোনার টুকরো পড়ে আছে। একটা টুকরো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ঝিলম। দেখে চব্বিশ ক্যারাট সোনাই মনে হয় বটে। টুকরোটা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝিলম। তার কাছে সোনার কোনো আলাদা মূল্য নেই। অন্যান্য ধাতুর মতন সোনাও তো আর একটা ধাতু মাত্র। তারপর পাহাড়টা ঘুরে রকেট-স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

মাত্র বারোটি রকেট সেখানে সাজানো রয়েছে পরপর। এত কম রকেট কেন? মহাকাশে ডাকাতি করে চোখ আর কানের পর্দা নিয়ে আসছে। কিন্তু পৃথিবীর সেইসব মানুষদের রকেটগুলো এরা আনে না। খুব সম্ভবত এখানে রকেট চালাবার মতন লোক বেশির ভাগই অসুস্থ! অথবা পৃথিবীর মানুষদের উন্নততর রকেট এরা চালাতে জানেনা।

শুক্রগ্রহের লোকগুলো এখনো হাল ছাড়েনি। যে-চৌকো বাক্সের মতন অস্ত্রে ওরা যে-কোনো জিনিস টেনে নিতে পারে, সে-রকম অনেকগুলি বাক্স এনে ঝিলমকে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কোনোটাতেই কাজ হল না।

ঝিলম বলল, "এবার দেখুন আমি কী করি!"

কোটের পকেট থেকে তার ছোট্ট অস্ত্রটি বার করে সে তাক করল রকেটগুলোর দিকে। একটার-পর-একটা রকেট ঝুরঝুরিয়ে গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল।

শুক্রগ্রহের লোকেরা হায়-হায় করতে লাগল। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল তাদের মধ্যেকার কয়েকটি মেয়ে।

সবকটা রকেট শেষ করে দিয়ে ঝিলম বলল, "রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঝটিকা-বাহিনী আপনাদের কী শাস্তি দেবে বা কী ব্যবস্থা নেবে তা আমি জানি না. তার আগে, আপনাদের আমি এই শাস্তি দিলাম! আপনারা আত্মসমর্পণ করেননি, সেইজন্য আপনাদের আমি দিয়ে গেলাম এখানে নির্বাসন। যতদিন ঝটিকা-বাহিনী না আসে, ততদিনের জন্যে আপনারা এই সোনা নিয়ে থাকুন। ততদিনের মতন খাবার-দাবার আপনাদের আছে আশা করি? নইলে আপনাদের থাকতে হবে এই সোনা খেয়ে। ঝটিকা-বাহিনী যদি আর কোনোদিনই না আসে তা হলে এই হ্রদের তীরে আপনাদের চাষবাস শুরু করতে হবে, আবার ফিরে যাবেন আদিম জীবনে।"

একদল লোক এবার চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা ক্ষমা চাইছি! আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। দয়া করে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

ঝিলম বলল, "আর উপায় নেই!"

কট্ কট্ কট্ কট্ করে একটা শব্দ হল ওপরের আকাশে। একটা মনো-ইউনিট নেমে আসছে। ঠিক সময়ে ওটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে রা আর ইউনুস। স্বয়ংক্রিয় মনো-ইউনিট এসে থামল ঝিলমের কাছেই। আপনা-আপনি একটা দরজা খুলে গেল।

ঝিলম সেদিকে পা বাড়াতেই একজন মহিলা ছুটে এল তার দিকে। মহিলাটির কোলে একটি এক বছরের শিশু।

মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হে দেবদূত—"

ঝিলম বলল, "আমি দেবদূত নই, আমি পৃথিবীর মানুষ।"

মহিলাটি বলল, "আমার স্বামী এখানে বিস্ফোরণে মারা গেছেন। আমার এই ছেলেটির জন্ম হয়েছে এখানেই। এই নক্ষত্রে আর একটিও শিশু নেই। আমার যা হয় হোক, আপনি একে বাঁচান। আপনি দয়া করে একে নিয়ে যান পৃথিবীতে যাতে ও মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে।"

ঝিলম বলল, "শিশুদের কোনো অপরাধ হয় না। আমার এই গাড়িটাতে একজনের বেশি জায়গা নেই কোনক্রমে এই শিশুটিকে নেওয়া যেতে পারে। ওকে মাটিতে নামিয়ে রাখুন। সোনা কী জিনিস তা ও এখনো চেনে না। আশা করি ও নির্লোভ মানুষ হয়ে বাঁচতে পারবে।"

মহিলাটি শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে এক পা এক পা করে পিছু হটে গেল। ঝিলম শিশুটিকে বুকে তুলে নিল। সে ঘুমিয়ে আছে, সে কিছুই টের পাচ্ছে না।

ছেলেটিকে নিয়ে ঝিলম মনো-ইউনিটে উঠতেই দরজা বন্ধ হল সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর সেটা আবার উড়ে গেল মহাকাশে একটু পরেই অসীম নীলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।